শ্রী সরোজকুমার রায়চৌধুরী

গ্রন্থবাণী
১৬ ম্যাঙ্গো লেন, কলিকাতা-১

প্রকাশক
শ্রীসুনীল মণ্ডল

মণ্ডল বুক হাউসের
প্রথম সংস্করণ—মাঘ ১৩৬৬

দাম দুটাকা পঞ্চাশ নয়া পয়সা

প্রচ্ছদপট এঁকেছেন
শ্রীগণেশ বসু

এশিয়ান প্রিণ্টার্স থেকে
শ্রীসুলভ কুমার বসু
কর্তৃক মুদ্রিত

শ্রীশচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত

প্রিয়বরেষু—

## এই লেখকের

আকাশ ও মৃত্তিকা
হংস বলাকা
কৃষ্ণা
ঘরের ঠিকানা
শৃঙ্খল
নতুন ফসল :
    ময়ূরাক্ষী
    গৃহকপোতী
    সোমলতা
কালোঘোড়া
মহাকাল
শতাব্দীর অভিশাপ
পান্থনিবাস

শুক্ল সন্ধ্যা
মধুমিতা
তিমির-বলয়
(১ম ও ২য় পাঠ)
সোম-সবিতা
শ্রেষ্ঠ গল্প
নীলাঞ্জন
অনুষ্টুপ ছন্দ
কৃশানু
মনের গহনে
ক্ষুধা
বন্ধনী
হালদার সাহেব

# মরুচক্র

বন্ধু, আমাকে এই ছোট মেসে দেখে তুমি অবাক হয়ে গেছ। এবং এখানে আমার অত্যন্ত ক্লেশ হচ্ছে ভেবে উদ্বেগও প্রকাশ করেছ। এ জগতে মানুষের জন্যে মানুষের আন্তরিক উদ্বেগ অবশ্যই সুদুর্লভ। এজন্যে নিশ্চয়ই তোমায় ধন্যবাদ দিতাম। কিন্তু তুমি তো জান না—তুমি ভাবতেই পার না, অত্যন্ত পুরোণো, ভাঙা বাড়ীর একখানি প্রায়ান্ধকার ঘরে আমরা ক'টি হতভাগ্য প্রাণীতে ঘেঁসাঘেঁসি করে কি আনন্দেই দিন রাত্রি যাপন করি। এর আগে তুমি আমায় দেখেছ বড় বাড়ীর সুসজ্জিত কক্ষে। কিন্তু সেখানে দিন আর কাটতে চাইত না। প্রত্যেক মুহূর্তে আমাকে তার পর মুহূর্ত কাটাবার জন্যে উত্তেজক উপলক্ষ্য সৃষ্টি করতে হত। আর এখানে কি হয় জান? এখানে আমি থাকি নিশ্চিন্তে বসে. ছোট নদীর মতো দিন আমার পাশ দিয়ে বয়ে যায়। নিঃশব্দে নয়, কলকণ্ঠে। তবু জানতে পারি না।

তবে বলি শোন:

সকাল তখনও হয়নি। বাইরে অল্প অল্প ফর্সা হয়েছে, কিন্তু ঘরে অন্ধকার রয়েছে। শীতের দিনে পাঁচটি প্রাণী এইটুকু ঘরে প্রায় পিঠে পিঠ ঠেকিয়ে নিদ্রামগ্ন। অকস্মাৎ কাণের কাছে একটা ভাঙা শানাই শেষ খাদে বেজে উঠল। ঘুমের ঘোরে শুনলে তাই মনে হয় বটে, কিন্তু ভাঙা শানাই নয়। ওটা ঘোষাল মশায়ের কণ্ঠস্বর। ঘোষাল এই মেসে খান, থাকেন বাইরে।

দরজার গোড়ায় দাঁড়িয়ে তিনি বললেন, এই যে মুটুবাবু, ঘুমিয়ে আছেন? আমি বলছিলাম, সুদের সেই ক'আনা পয়সা আজকে দেবার কথা ছিল। দেবেন কি?

এ কণ্ঠস্বরে ঘুম আমাদের সবারই ভেঙে গেল। মুটুবাবু পাশ ফিরতে ফিরতে আহত জন্তুর মতো এক প্রকার গোঁ-গোঁ শব্দ করলেন। তার অর্থ আমরা কেউ না বুঝলেও, ঘোষাল মশাই বুঝলেন।

চৌকাঠের ওপর উবু হয়ে বসে তিনি নির্লিপ্তভাবে বললেন, যাকগে। আর একটা কথা। কাল রাত্রে নারায়ণের নাম করতে করতে ভেবে দেখলাম, মেসে আমাদের বেশি পড়ছে। এইটে জানাবার জন্মেই বিশেষ করে এত ভোরে আসা।

ম্যানেজার বটুক ঘোষ শুয়ে ছিলেন। এইবার ধড়মড় করে উঠে বসলেন। যে বিলিতি কম্বলটা মুড়ি দিয়ে শুয়েছিলেন, সেটা সর্বাঙ্গে জড়াতে জড়াতে বললেন, কি করে?

তাঁকে অমন অকস্মাৎ উঠতে দেখে ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে ঘোষাল মশাই প্রথমে বললেন, এই যে বটুকবাবু!

কিন্তু তখনই নিজেকে সামলে নিয়ে বললেন, তা একটু বেশি বই কি! প্রথমতঃ বাইরে থাকি, চাকরের পুরো সুবিধা পাই না। অথচ পুরো এস্টাব্লিশমেন্ট চার্জ দিতে হয়। আমি বলি শুনুন, প্যালাটা কৎটুকুনই বা খায়? তা হোক। খাওয়ার চার্জ ওর পুরোই পাবেন, কিন্তু এস্টাব্লিশমেন্ট অর্ধেক। ফ্যালার অবশ্য দুইই পুরো হবে। আর আমি তো ছুটিতে—এখনও একমাস আছি। আমার ফ্রেণ্ডস্-চার্জ। না পারেন তো বলুন, কাল থেকে তাহলে অন্যত্র ব্যবস্থা করব।

তাঁর কণ্ঠস্বর কঠিন।

বটুক ঘোষ অঙ্কের মাষ্টার। মনে মনে হিসাব করে দেখলেন,

ঘোষাল মশাই ছুটিতে থাকলেও কলকাতায় যে রকম ঘন-ঘন তাঁর যাওয়া-আসা, তাতে ফ্রেণ্ডস্ চার্জে তাঁর অনেক বেশিই পড়বে সে বিষয়ে সন্দেহ নেই।

বললেন, তাতে কি আপনার সুবিধে হবে ?

ঘোষাল মশাই সোৎসাহে বললেন, অনেক সুবিধে হবে মশাই। বেশ ভালো করে ভেবে দেখেছি। আজকাল কি হয়েছে জানেন, টাকা-পয়সা সম্বন্ধে ভয়ানক হুঁসিয়ার হয়েছি। একটি পয়সা বাজে খরচ হলে মনে হয়, গায়ের এক ফোঁটা রক্ত গেল। টাকার ওপর বড্ড মমতা বেড়েছে।

টাকার ওপর ঘোষাল মশায়ের মমতা বৃদ্ধি বটুক ঘোষের অঙ্কের হিসাবে ধরা পড়ল না। শুধু আজই নয়, কোনোদিনই ধরা পড়েনি। মানুষের বিপদে তিনি পরের কাছে থেকে চড়া সুদে টাকা ধার করে এনে বিপন্নকে দেন। সুদের তাগাদাও করেন মাঝে মাঝে। কিছু-কিছু সুদ পানও। কিন্তু আসল কখনও পেয়েছেন, ঘোষাল মশায়ের ঘনিষ্ঠ সন্নিধানে থেকেও বটুকবাবু সে খবর এখনও পাননি। যখন টাকা পয়সার হিসাব তিনি করেন, বটুকবাবু সন্ত্রস্ত হয়ে ওঠেন। তাঁর সন্দেহ থাকে না, এর ফলে ঘোষালের লোকসানের অঙ্ক বেড়ে যাবে। কিন্তু সে কথা তাঁকে বলে কে! বললেও তো শুনবেন না!

এই হট্টগোলের মধ্যে কতক্ষণ শুয়ে থাকা যায়! ঘুম-ভাঙার আগেই সুদের তাগাদায় নুটুবাবুর মনটা খিঁচিয়ে গেছে। এতক্ষণে নুটুবাবু উঠে বসেছেন। বিছানায় বসে বসেই তিনি দেওয়ালে বিলম্বিত মহাদেবের মুর্তিকে ঘন-ঘন মাথা নেড়ে প্রাতঃপ্রণাম জানাচ্ছিলেন।

ঘোষাল মশাই তাঁর দিকে ফিরে বললেন, নুটুবাবুকে বলছি, ফ্যালাটাকে তো শেষ কথা বলে দিলাম।

—কি রকম ?

ঘোষাল মশাই বিস্মিতভাবে জিগ্যেস করলেন, শোনেন নি সেকথা ?

—না।

—ব্যাটা বলে কি না, বাবা বোগাস্! সে কি রে বাবা! বললাম, বাপু, 'বোগাস্' কথাটি যদি শুদ্ধ করে বানান করতে পার, তোমার হাত-খরচ মাসে দু'টাকা করে বাড়িয়ে দোব। তিনবার ম্যাট্রিক ফেল করে বাবার ওপর ইংরিজি ঝাড় !

আমরা হাসি চাপতে চাপতেও হেসে ফেললাম।

ঘোষাল মশাই আমাদের হাসি থামিয়ে দিয়ে উত্তেজিতভাবে বললেন, কিন্তু আমিও সে বাবা নই। স্পষ্ট বললাম, বাপধন, মার্চে হোমিওপ্যাথি পড়া শেষ হবে। তারপরে আর আমি মোট একশোটি টাকা তোমায় দোব। ওই নিয়ে যা-করে-হয় নিজের পেটটা চালাবে। এ 'বোগাস্ বাবা'র কাছ থেকে আর একটি পয়সাও পাবে না।

বলে ঘোষাল মশাই যেন আমাদের ওপর রাগ করেই হন্-হন্ করে বেরিয়ে গেলেন।

সঙ্গে সঙ্গে পাশের বাড়ীতে অনেকগুলি নারীকণ্ঠ একসঙ্গে ধ্বনিত হয়ে উঠল। এইটুকু বললে ব্যাপারটা তোমার বোধগম্য হবে না জানি। কারণ এ ধ্বনি যে কি ধ্বনি, যে না শুনেছে তার সাধ্য কি এর রসগ্রহণ করে! উদারা, মুদারা, তারা, তিন গ্রামে গোটা তেত্রিশেক কণ্ঠ যেন ভাজা খৈএর মতো ফেটে পড়ল। সে শব্দসমুদ্রে দিগ্‌ নির্ণয় করা অসম্ভব।

এত ভোরে কেন এ কলহ কিছুই বোঝা গেল না। টুকরা

টুক্‌রা কথায় এইটুকু মাত্র বোঝা গেল যে, যে সকল কারণে এই প্রভাতে এতগুলি নারীচিত্ত বিচলিত হয়ে উঠেছে তার একটি জল, আর একটি লক্ষ্মীপূজা। অনুমান করা গেল, লক্ষ্মীপূজার দিন ওঁদের স্নানের জলের অভাব ঘটেছে। কিন্তু কলহ ক্রমেই বর্তমান কালকে অতিক্রম করে বিদ্যুৎবেগে দূর এবং দূরতর অতীতকালের দিকে অগ্রসর হতে লাগল। গতি কোথাও সরল, কোথাও তির্যক্‌, কোথাও বা বক্র,—যখন যে ভাবে গেলে প্রতিপক্ষকে পরাস্ত করা যায়।

কিন্তু এত দূর থেকে কে কোন্‌ পক্ষ নির্ণয় করা আমাদের পক্ষে অসম্ভব। এবং কণ্ঠই যেখানে সর্বশ্রেষ্ঠ ও একমাত্র অস্ত্র, তর্কের বস্তু বাক্যের জালে যেখানে প্রতিমুহূর্তে আচ্ছন্ন হয়ে হারিয়ে যাচ্ছে, সেখানে কি করে বলা, কোন পক্ষ জিতল আর কোন পক্ষ হারল। তবে বাক্‌যুদ্ধের এই একটিমাত্র শ্রেষ্ঠত্ব আমি স্বীকার করি যে, জয়-পরাজয়ের মীমাংসা না হলেও, এবং বিনা আপোষেও, এ যুদ্ধের বিরতিতে বাধা ঘটে না। মানুষের কণ্ঠ আর কিছু না মানলেও ক্লান্তি মানে।

বোধ করি, সেই জন্যেই ও বাড়ীর কলহ ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই ধীরে ধীরে স্তিমিত হয়ে আসতে লাগল। কেবল হাওয়া যাতে একেবারে মিইয়ে না যায় সে জন্যে অপেক্ষাকৃত মৃদু সুর একটা বাজতে লাগল। দেখা যেতে লাগল, মেয়েরা একে একে একখানি করে গামছায় নিজেকে যথাসম্ভব আবৃত করে কাপড় মেলে দেবার জন্যে ছাদে উঠতে লাগলেন। আশা হল, আর পনেরো মিনিট না হোক, আধঘণ্টার মধ্যেই ওটুকু কলগুঞ্জনেরও নিবৃত্তি ঘটবে। কিন্তু মানুষের আশাকে ধ্বংস করবার জন্যে ভগবানের বজ্র যেন উদ্যত হয়েই আছে।

মুটুবাবু একটা আড়ামোড়া ভেঙে কেবল জিগ্যেস করেছেন, কে গেল? অর্থাৎ পায়খানায় কে গেল? আর বটুক ঘোষ মুক্ত

কচ্ছ পায়ের গোড়ালি দিয়ে পিছনের দিকে ছুঁড়তে ছুঁড়তে কেবল তার উত্তর দিতে যাবেন, এমন সময়ে পাশের বাড়ীতে, লোকেরা নয়, যেন বাড়ীখানাই আবার চীৎকার করে উঠল। মুক্ত কচ্ছ মুক্তই রইল, রইল পড়ে মুটুবাবুর প্রশ্ন। হাঁ, ভরসা হল বটে স্ত্রী-স্বাধীনতার এখনও কিছু দেরি আছে। কী দৃপ্ত বাক্‌ভঙ্গী! কী অমিত বলশালী কণ্ঠ! তেত্রিশটি নারী তেত্রিশকোটি হয়ে অনর্গল প্রশ্নের পর প্রশ্নে ভদ্রলোককে জর্জরিত করে তুলেছেন। আর ভদ্রলোক চক্ষের পলকে ঘাড়ের মোট মেঝেয় নামিয়ে আপনার ভারী কণ্ঠস্বরে সমস্ত আওয়াজ যেন ধামাচাপা দিয়ে দিলেন। মনে হল, তাঁর আর প্রতিপক্ষ নেই। একাই ইচ্ছে করে খানিক গলার কসরৎ করছেন। রমণীর স্বরলহরী তাঁর সুরের সুরধুনীতে বিলীন হয়ে গেল।

মুটুবাবু বিরক্ত হয়ে বললেন, আঃ! ও লোকটাও বাজারের পয়সা চুরি করতে ছাড়বে না, মেয়েরাও চ্যাঁচাতে ছাড়বে না। মাঝে থেকে আমাদের হয়েছে মরণ।

বটুক ঘোষ মুক্ত কচ্ছ যথাস্থানে সন্নিবেশ করতে করতে বললেন, রোজই কি আর চুরি করে মশাই? বিড়ির পয়সার টানাটানি পড়লে এক আধ দিন হয়তো করে। দেখছেন না, মেয়েরা যেন ওকে কি পায়!

—পায়, না হয় বুঝলাম। কিন্তু ওরই বা এ কেলেঙ্কারী করতে রোজ রোজ যাওয়া কেন? না গেলেই তো পারে!

—না গেলে যাবে কে? সবারই চাকরী আছে, কেবল ওই বেচারাই বেকার। একটা কিছু না করলে চলবে কেন? সুতরাং ওরই ওপর চাপ পড়ে।

একটু হেসে বটুক ঘোষ বললেন, ওরও কি আর স্বার্থ নেই? আছে।

মুটুবাবু উঠে বসে গেঞ্জি পরতে পরতে বললেন, সেই কথাই বলছি।

মুটুবাবুকে গেঞ্জি পরতে দেখে বটুক ঘোষ তাড়াতাড়ি বাইরের দিকে পা বাড়ালেন।

তা দেখে শুষ্কমুখে মুটুবাবু জিগ্যেস করলেন, আপনি চললেন না কি? একটু তাড়াতাড়ি আসবেন। আমার আবার কাল থেকে···তার ওপর খিচুড়ীও খেয়ে ফেললাম অনেকটা···

মুটুবাবু বিড় বিড় করে বলতে লাগলেন, একটা পায়খানা··· আমাদের হয়েছে পয়সা কম···নইলে ··

মুটুবাবু আর একবার গা গড়িয়ে নেবেন কি না ভাবতে লাগলেন। আর বটুক ঘোষ সিঁড়ি দিয়ে নামতে লাগলেন। দেখেছ তো, আমাদের সিঁড়ির প্রতি ধাপে এক জোড়া করে জুতো। সেখানে ছাড়া জুতো রাখার জায়গাও আর নেই।

বটুক ঘোষ নামতে লাগলেন। তিনি নিচের দিকে বড় একটা চান না। জুতোগুলো তাঁর পায়ে লেগে ছিট্‌কে ছিট্‌কে পড়তে লাগল। কোনোটা বা পায়ের নিচে চিপ্‌সে গেল। কিন্তু অত নজর দেবার তাঁর উপায় নেই, সময়ও নেই। সাড়ে সাতটায় একটা ট্যুইশান আছে।

মুটুবাবু করুণ নেত্রে জুতোগুলোর দুর্দশা দেখতে লাগলেন। নিরীহ মানুষ। কোনো ব্যাপারে তিনি সহজে উত্তেজিত হন না। কণ্ঠস্বরও চড়ে না।

বিনীত কণ্ঠে বললেন, জুতোগুলো গেল যে! একটু আস্তে যাবেন বটুকবাবু।

কথাটা বটুকবাবুর কানে গেল বলে মনে হল না।

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে মুটুবাবু বলতে লাগলেন:

ছ'মাস হয়নি এখনও চোদ্দ সিকে দিয়ে জুতোজোড়া কিনলাম। এ মেসে থাকতে গেলে অতদামের জুতো কেনা ঠিক হয়নি। আর করবই বা কি! ক্যাম্বিসের জুতো কিনব তো সেও শ্রীচরণের ছাপে

পরা যাবে না। রাখবারও জায়গা নেই। কাল থেকে মাথার গোড়ায় রাখতে হবে দেখছি।

আরও একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে নুটুবাবু একটি একটি করে হাতের পয়সাগুলো গুণতে লাগলেন। সকালের বাজারের পয়সা। এমাসে তিনিই ম্যানেজার হয়েছেন।

হাঁকলেন, বাজারে কে যাচ্ছ হে বাবুরা। পয়সাটা নিয়ে আমাকে দয়া কর এইবার।

নরহরির ঘুম ভাঙে আটটায়। স্নানাহার ইত্যাদিতে এক ঘণ্টা। দশটায় আফিস। বয়স তার অল্প। সেই কারণে আশঙ্কা জন্মেছে, মেসের সমান অংশীদার হয়েও ঠাকুর-চাকরের কাছে সে যথেষ্ট খাতির পাচ্ছে না। পাছে বয়সের মাপকাঠিতে তার সম্মানের পরিমাপ হয়, সেজন্যে সর্বদাই সে মেজাজ এক পর্দা উঁচুতে বেঁধে রাখে। কথা গরম মেজাজে বলে।

ঘুম থেকে উঠেই একটা হাই তুলে নরহরি গম্ভীর কণ্ঠে জিগ্যেস করলে, বাজার এসেছে ?

সুমুখের জানলার একটা কপাটে ঠেস দিয়ে নুটুবাবু আরাম করে এক সঙ্গে শীতের রৌদ্র এবং তাম্রকূট সেবন করছিলেন। নিচের দিকে একবার তাকিয়ে নিয়ে বললেন, দেখছি না তো।

হুঙ্কার দিয়ে নরহরি বললে, তার মানে ? কেন, এতক্ষণ কি করছে ? কে—বাজারে গিয়েছে কে ?

নুটুবাবু নিঃশব্দে তামাক টানতে লাগলেন, নরহরির কথার জবাব দিলেন না।

নরহরি আবার বললে, রোজ রোজ দেরি করে বাজার। একদিন মাছের ঝোল খেয়ে যেতে পারলাম না। এ-সব চলবে না। দাঁড়ান,

কাল থেকে আমি নিজে বাজার যাব। সব বাবুর চালাকি বের করছি।

হুটুবাবু টিপে টিপে বললেন, আজকে তো তোমারই বাজার যাবার কথা ছিল।

শুনে প্রথমটা সে থতমত খেয়ে গেল। কিন্তু থতমত খাওয়ার ছেলে সে নয়। তৎক্ষণাৎ চেঁচিয়ে বললে, ছিল তো ডাকলেন না কেন? যদি না উঠতাম, তাহলে বলতে পারতেন।

হুটুবাবু এ কথার আর জবাব দিলেন না। শুধু একটু মুচকে হাসলেন।

নরহরিও এক মিনিট চুপ করে রইল। তারপর আবার জিগ্যেস করলে, গেল মাসে চার্জ কত পড়ল?

হুটুবাবুর ঠোঁটের উপর পাতলা একটা হাসি খেলে গেল। কিন্তু অত সূক্ষ্ম জিনিষ নরহরির চোখে পড়ে না।

হুটুবাবু চিবিয়ে চিবিয়ে আস্তে আস্তে বললেন, তা তেরো টাকার কম হবে না।

—তে রো টা কা!

নরহরির চোখ কপালে উঠল।

বললে, বলেন কি মশাই? কুড়ি টাকা মাইনে পাই, তার তেরো টাকা মেসে! নাঃ! মশাই, আমি নোটিস দিয়ে রাখলাম। আসছে মাস থেকে আমি আর এ মেসে নেই! তেরো টাকা চার্জ! বাবাঃ!

নরহরি দু'হাত কপালে ঠেকিয়ে মেসের উদ্দেশে প্রণতি জানালে।

এমন সময় দেখা গেল, একটা মুটের মাথায় বাজার চাপিয়ে হন্তদন্ত

হয়ে জয়কালী আসছে। মুটুবাবুকে দেখে জয়কালী গলির মোড় থেকেই একটা হাত উর্ধ্বে তুলে চীৎকার করে বললে, কেষ্টাকে ছাড়লে না।

মুটুবাবু বিস্মিতভাবে বললেন, ছাড়লে না? কে ছাড়লে না? কোথায় সে?

নরহরি লাফিয়ে জানালার গোড়ায় এসে গর্জন করে বললে, তার মানে?

ভাবটা এই যে, তার চাকরকে আটকে রাখবার ক্ষমতা লাট সাহেবেরও নেই।

কেষ্টা মেসের চাকর। বছর বারো-তেরো বয়স। অনর্গল মিথ্যে বলতে পারে। দুষ্টুমীতে এরই মধ্যে এ পাড়ায় সে বিখ্যাত হয়ে উঠেছে। ওকে সবাই চেনে। সকালে জয়কালীর সঙ্গে সে বাজারে গিয়েছিল, সকল মেসের চাকর যেমন যায়। এখন জানা গেল, তাকে ছাড়ে নি।

কে ছাড়ে নি? কেনই বা ছাড়ে নি? সকাল বেলায় হঠাৎ কী এমন তার মূল্য গেল বেড়ে? বাজারে তাকে এত সমাদর করে কে?

জয়কালী যে ভাবে লম্বা লম্বা পা ফেলে বীরদর্পে মেসে প্রবেশ করলে, মনে হল, সে ওয়াটার্লু জয় করে ফিরছে। জামার কনুই থেকে আস্তিন পর্যন্ত লম্বা একটা ছেঁড়া। জুতো কর্দমাক্ত, তার একটা পাশ এমন হয়ে ছিঁড়ে গেছে যে, হাঁটতে গেলে ফস্-ফস্ করে শব্দ হচ্ছে।

তখনও সে হাঁফাচ্ছে। সবাই তার চার পাশে এসে নির্বাক বিস্ময়ে জমা হয়েছে।

মুটুবাবু তার সর্বাঙ্গ বার বার নিরীক্ষণ করে চিবিয়ে চিবিয়ে বললেন, তোমার জামা ছিঁড়ল কেন? এটা তো সেই নতুন পাঞ্জাবীটা? না?

জয়কালী ডান পা'টা বাড়িয়ে দিয়ে বললে, শুধু জামা ? জুতোটা দেখুন ! এখনও মাসখানেকও হয় নি।

মুটুবাবু বললেন, তাই তো দেখছি। ব্যাপারটা কি ?

জয়কালী বিরক্ত হয়ে বললে, তবে আর এতক্ষণ শুনলেন কি ? দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ঘুমুচ্ছিলেন ?

বিনীতভাবে মুটুবাবু উত্তর করলেন, কিছুই শুনি নি।

—শোনেন নি ? বললাম না, কেষ্টাকে ধরে রেখেছে ?

—কে ধরে রেখেছে ?

হাতের ঘুঁসি পাকিয়ে জয়কালী বললে, এক কথা একশোবার করে আমি বলতে পারব না। শুনলেন, আর না শুনলেন।

সকলকে হতভম্ব করে জয়কালী অত্যন্ত ক্রুদ্ধভাবে জুতোর কাদা ধুতে বসল।

এমন সময়ে কেষ্টা ঘাড় দুলিয়ে তুড়ি দিতে দিতে এল। মুখ টিপে টিপে হাসছে।

সবাই তাকে নিয়ে পড়ল।

—কি রে কেষ্টা ! কি হয়েছে ?

কেষ্ট প্রথমে বললে, কিছুই হয় নাই। তারপর বললে, ধরে রেখেছেল।

নরহরি ধমক দিয়ে বললে, সেই কথাই একশো বার শুনছি। কে ধরে রেখেছিল ?

আকাশে দুই হাত তুলে আড়ামোরা ভেঙে কেষ্টা বললে, বললাম তো, সায়েবে।

নরহরি আবার একটা ধমক দিতে যাচ্ছিল। মুটুবাবু হাতের ইঙ্গিতে তাকে নিরস্ত করে বললেন, থাম থাম। সাহেব ধরেছিল ? কেন ?

কেষ্টা শয়তানের মতো পিট্‌পিট্ করে আড় চোখে জয়কালীর

দিকে চাইলে। জয়কালী তখন গভীর মনোযোগের সঙ্গে জুতো সাফ করছে।

হুটুবাবু আবার জিগ্যেস করলেন, তোর গালের ওখানটা ছিঁড়ল কি করে?

কেষ্টা এবার আর নিজেকে সম্বরণ করতে পারল না। চীৎকার করে বললে, সেই বেটা ছিঁড়েছে!

—কোন্ বেটা?

—সেই বেগুনওয়ালা।

জয়কালী পিছন ফিরে কেষ্টার দিকে চেয়ে এক গাল হেসে বললে, বেটাকে দিয়েছি কি রকম গাঁট্টা? সর্ষের ফুল দেখিয়ে ছেড়েছি। বল?

কেষ্টা দুই হাতে চটাং করে একটা তালি মেরে বললে, আমিও দিয়েছি হারামজাদার কোঁকে দুই রাম-ঘুঁসি। বাপ্ বলে বসে পড়েছেল।

হুটুবাবু জিগ্যেস করলেন, তার পর সাহেব এসে ধরলে?

কেষ্টা নিশ্চিন্তভাবে বললে, হুঁ।

—সার্জেণ্ট সাহেব তো? তোদের তিনজনকেই ধরলে?

জয়কালী সংশোধন করে বললে, ওকে আর সেই বেটাকে ধরলে। আমাকে ধরবে? হুঁঃ! আপনাদের ভাবনার বাহাদুরি আছে!

জয়কালী ঠোঁট বেঁকিয়ে উপেক্ষাভরে হাসলে।

হুটুবাবু কেষ্টাকে পুনরপি জিগ্যেস করলেন, তারপর তুই কি করলি?

কেষ্টা জবাব দিলে, কি আর করব? বললাম।

—বললি? বেশ, বেশ। কি বললি?

অনতিদূরে একটা চড়ুই কিচ্‌মিচ্ করছিল। কেষ্টা আপন অজ্ঞাতসারে অভ্যাসবসে সেদিকে একবার তাক করে বললে, সব

কথাই বললাম। আমি কি সায়েবকে ভয় করি নাকি? বরং ওই বেটাই কান্নাকাটি করছিল।

সবাই অতিষ্ঠ হয়ে উঠল।

নরহরি একটা হাত উঁচিয়ে বললে, দোব ছোঁড়ার মাথায় একটা চাঁটি। আসল কথা ভাঙে না, কেবল প্যাঁচ মারে!

কেষ্টা ঝাঁঝিয়ে বললে, কি প্যাঁচ মারি? বললাম তো সব কথা।

নুটুবাবু নরহরিকে থামিয়ে বললেন, বলছে, বলছে। তা পরে কেষ্টা, সাহেবকে বললি সব কথা?

ধমক খেয়ে কেষ্টা একটু ক্ষুণ্ণ হয়েছিল। বললে, বললাম বই কি!

—কি বললি?

—বললাম, বেগুনওয়ালা আমাকে পেথমে গাল দিয়েছেল।

—খামখা গাল দিলে? কেন গাল দিলে বললি না?

—বললাম বই কি! বললাম, আমি বেগুনের দর করেছিলাম বলে আমাকে গাল দিলে, গালে চড় মারলে।

বলে নিজের গালে একবার হাত বুলোলে। জায়গাটা তখনও লাল হয়ে ছিল। লম্বা লম্বা আঙুলের দাগ বসে গেছে।

নুটুবাবু মিষ্টি মিষ্টি হেসে বললেন, তাইতেই কি কেউ কাউকে মারে রে বোকা? দর কি কেউ করে না? সাহেব তো আর ঘাস খায় না?

কেষ্ট উত্তেজিতভাবে বললে, কি ঘাস খায় না! মাইরি তাই হয়েছিল। বিশ্বেস না হয় জিগ্যেস করুন জয়কালীবাবুকে। ওই তো সামনেই রয়েছেন।

জয়কালীর জুতো পরিষ্কার শেষ হয়েছিল। হাসতে হাসতে বললে, হ্যাঁ, তুমি খুব সাধু! বুঝলেন মশাই, গোটা বাজারে তিন পয়সার নিচে বেগুন নেই, ও বললে, এক পয়সা সের দিবি? দিয়েছেও আচ্ছা এক চড়, মুখখানা বেগুন বানিয়ে ছেড়েছে!

—কি বেগুন বানিয়ে ছেড়েছে! আমি বললাম, এক পয়সা সের দিবি?

—বললি না?

—বললাম? আমি দু' পয়সা সের বলিনি?

—বলেছিলি! ব্যাটা নিজেও মার খেলে, আমারও

বলে জয়কালী ছিন্ন জামা ও জুতোর পানে সকরুণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করলে।

তারপর ক্রুদ্ধকণ্ঠে বললে, আমি না থাকলে দিত আজ তোমাকে শেষ করে।

ক্ষুব্ধভাবে কেষ্টা বললে, দিত!

ঝুটুবাবু বললেন, যাক-গে বাবা! আর সেম-সাইড গোল করতে হবে না। এখন মাছ-তরকারী কোটগে। আর সমন-টমন আসবে না তো? ব্যস্। তাহলেই হল।

তখন সকলে জয়কালীকে নিয়ে পড়ল।

ঝুটুবাবু জয়কালীকে জানালার ধারে নিজের বিশেষ স্থানটিতে বসিয়ে সবাইকে উদ্দেশ করে বলতে লাগলেন, তোমরা যে সবাই জয়কালীকে ডাল-রুটির যম বল, এবারে শিক্ষা হল তো? অত বড় বাজারে···একা···তোমরা হলে পারতে? আর সম্বলের মধ্যে তো ওই কেষ্টা,—এক ফোঁটা বাঁদর। ওহে রক্ষাকর, তোমাদের আপিস অঞ্চলে নেপালী-টেপালী পাওয়া যায় না? একটু খবর নিও দিকি।

রক্ষাকর একখানা ছেড়া কাপড় রিপু করছিল। বিস্মিতভাবে জিগ্যেস করলে, নেপালী কি হবে?

—রাখা ভালো। মেসেও রইল, জয়কালীও রইল। কখন কি ঘটে, বুঝলে না?

একটু থেমে বললেন, অবশ্য দরকার হত না। কিন্তু জয়কালীর শরীর তো ভালো নয়। ওষুধটা নিয়মিত খাচ্ছ তো জয়কালী? দেখি তোমার চোখ! হুঁ। ও-চোখ দেখি? হুঁ। একেবারে সাদা! রক্তের চিহ্ন পর্যন্ত নেই। আর জ্বর হয়?

জয়কালী শরীরের দিকে চাইতে চাইতে বললে, ঠিক বুঝতে পারি না।

—সকাল বেলায় মুখ বিস্বাদ হয় না?

—একটু হয় বোধ হয়। ঠিক বুঝতে পারি না।

—রাত্রে ঘুম হয়?

—ঘুম তো ভালোই হয়।

—তা হোক। মনটা তো সরল। তার ওপর সমস্ত দিন হুটোপুটি আছে। ঘুম হবে। তুমি এক কাজ কর, সকালে-বিকেলে একটা করে কমলালেবু তুমি খাও দিকি। এক মাসের মধ্যে শরীর সেরে যাবে।

রক্ষাকর হেসে বললে, কেন অত হাঙ্গাম করছেন? তার চেয়ে নেপালীই রাখুন। আমি দেখে দোব একটা বেশ ডাগড়া গোছের। ভোজালী-ওয়ালা।

জিহ্বা দিয়ে তালুতে একটা টোকা মেরে নুটুবাবু বললেন, ওই তো তোমাদের দোষ! কিছুতে বিশ্বাস করতে চাও না, জয়কালীর শরীর খারাপ।

রক্ষাকর বললে, খারাপ? ওজন নিয়ে দেখবেন দিকি। দুটি মণের কম হবে না।

—এই, এই! খুঁড়তে আরম্ভ করে দিলে! এই জন্যেই তো ওর শরীর সারছে না।

জয়কালী চোখ পাকিয়ে রক্ষাকরকে বললে, তোমাকে বার বার নিষেধ করেছি আমার সম্বন্ধে কিছু বলবে না। একদিন ফৌজদারী হয়ে যাবে বলে দিচ্ছি।

ন্টুবাবু বাধা দিয়ে বললেন, না, না। এখন ওসব করতে হবে না। শরীর সেরে নাও, তখন ওরাই আর বলতে সাহস করবে না। আমি যা বললাম তাই কর, স্রেফ দুটি করে কমলালেবু। চোখ-মুখের ফ্যাকাসে ভাব কেটে যাবে। ওর এক একটি ফোঁটায় এক ফোঁটা রক্ত।

ইত্যবসরে হেলতে দুলতে নরহরি এল।

বললে, এ সব চলবে না। জয়কালী যেদিন বাজারে যাবে রাজ্যের জঙ্গল ঝেঁটিয়ে নিয়ে আসবে। ও সব শাক-পাত এ মেসে চলবে না। আজ রাত্রে মাংস হবে। আমি বলছি।

'আমি'র ওপর নরহরি বিশেষ জোর দিলে। তেরো টাকা চার্জের কথা ইতিমধ্যে সে নিশ্চয় ভুলে গেছে।

নরহরির সঙ্গে জয়কালীর অহি-নকুল সম্পর্ক।

তেলে-বেগুনে জ্বলে উঠে জয়কালী বললে, ওঃ। লাটসাহেব!

গম্ভীর কণ্ঠে নরহরি হাঁকলে, এই কেষ্টা!

কেষ্টা তৈরী চাকর। নরহরির প্রথম চার-পাঁচ ডাক কাণেই তুললে না। অবশেষে যখন নিতান্ত না শুনে পারা গেল না, তখন নিচে থেকেই মিহি কণ্ঠে সাড়া দিলে, কি বলছেন?

ওপর থেকে নরহরি হাঁকলে, শুনে যা।

—কি শুনে যা! আমি মাছ কুট্‌ছি যে।

হাল ছেড়ে দিয়ে নরহরি বললে, আচ্ছা বাবা! রক্ষাকর, দাড়িটা কামিয়ে দাও তো হে। তুমিও কামাবে নাকি?

রক্ষাকর দাড়ি কামানোর সরঞ্জাম নিয়ে নিজেই আসছিল। বললে, কামাব বইকি!

নুটুবাবু খুব তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে রক্ষাকরের মুখমণ্ডল নিরীক্ষণ করে আস্তে আস্তে বললেন, দাড়ি কি বেরিয়েছে? কালকেই তো কামালে মনে হচ্ছে।

রক্ষাকর মনে মনে লজ্জিত হচ্ছিল। নরহরি তার হয়ে উত্তর দিলে, ও রোজ কামায় কি না!

রক্ষাকরের লজ্জার কারণ ছিল। বেচারা অল্প মাইয়ের একটা ওষুধের দোকানে কাজ করে। তাও নিয়মিত মাইনে পায় না। অথচ থাকে ওরই মধ্যে একটু পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন। সেটাকে আর সবারই সঙ্গে সঙ্গে ও নিজেও অপরাধ বলে ভাবতে শিখেছে। এখন পরিষ্কার থাকাটা ওর রোগের মধ্যে দাঁড়িয়েছে। প্রত্যহ দাড়ি কামিয়ে কামিয়ে ওর কামানোর হাত গেছে পেকে। মেসের প্রায় সবাই সেই পাকা হাতের সদ্ব্যবহার করে। রক্ষাকরও সেজন্যে কিছুমাত্র বিরক্তি বোধ করে না।

সে শুধু একবার বললে, দাঁড়াও ভাই। আমি আগে কামিয়ে নিই।

কিন্তু নরহরি তাকে আমল দিলে না। ওদের চেয়ে দু'তিন টাকা কম মাইনে পায় বলে তাকে কেউই আমল দেয় না। ডান হাত দিয়ে দাড়িতে জল বুলোতে বুলোতে নরহরি বললে, আরে নাও, নাও। তোমার তো আর আপিস নয়। দোকানের কাজ, দু-পাঁচ মিনিট দেরি হলে ভাগবত অশুদ্ধ হবে না।

রক্ষাকর নিরীহ মানুষ। অপেক্ষাকৃত অল্পবেতনভোগী বলে সে যথেষ্ট কুণ্ঠিত হয়েই থাকে। তার উপর তার ঠিক আপিস নয়, একটা ঔষধের দোকানমাত্র। সুতরাং এর পরে আর তার আপত্তি করার কিছু রইল না। নিঃশব্দে নরহরির দাড়ি কামাতে বসল। নরহরি কামানোর শেষে আয়নায় মুখ দেখে গেল চটে।

দাঁত-মুখ খিচিয়ে বললে, দিয়েছ তো কেটে! আমার হয়েছে যত আনাড়ি নিয়ে কারবার!

কুণ্ঠিতভাবে রঙ্গাকর বললে, ও কিছু না। বোধ হয় ব্রণ ছিল, তাই।

নরহরি বিরক্ত হয়ে বললে, ছিল ব্রণ! আমার তোমার মতো মুখ কিনা! একটু স্নো দাও।

রঙ্গাকর নিয়মিতভাবে স্নো ব্যবহার করে। এই তার একমাত্র নেশা। স্নো'র কৌটা সর্বদা পকেটেই রাখে। কাজ-কর্মের আড়ালে যখনই একটু অবসর পায়, একবার মেখে নেয়। নরহরির ক্রোধ-শান্তির জন্যে সে তাড়াতাড়ি কৌটো এনে দিলে। তাকে অনুগৃহীত করছে, এইভাবে স্নো মেখে কৌটোটা ঢাকা না দিয়েই নরহরি স্নান করবার জন্যে নিচে নেমে গেল। বলে গেল, স্নানের পর আর একবার মাখবে।

এর পরে আরও দু'একজন রঙ্গাকরের কাছে কামিয়ে গেল। তখন সে নিজের দাড়ি কামাবার ফুরসুৎ পেলে।

ছাদের একটা কোণে গিয়ে দুই হাঁটুর মধ্যে আয়নাটা রেখে সে বেশ যত্ন করে কামালে। মুখে পরিপাটি করে স্নো মাখলে। সময় কম। তাড়াতাড়ি গামছাখানা কাঁধে ফেলে স্নান করতে যেতে হল। কিন্তু স্নান সেরে ফিরে এসে একবারে মাথায় হাত দিয়ে বসল।

—কি ব্যাপার?

বললে, আমার ধোয়া কাপড়খানা পাচ্ছি না।

—আছে এইখানেই কোথাও। খেয়ে তো এস।

একটু খুঁৎ-খুঁৎ করে রঙ্গাকর খেতে গেল। ফিরে এসে সমস্ত ঘর তন্ন তন্ন করে খুঁজলে। কোথাও পেলে না। যেখানে যা ছিল সব আছে, কেবল সেই ধোয়া কাপড়খানিই নেই। সবাই আফিস যাওয়ার আয়োজন করতে লাগল। কিন্তু সে বিষণ্ণচিত্তে চুপ করে বসেই রইল।

—কি হে যাবে না?

বিমর্ষমুখে রক্ষাকর বললে, কি করে যাই !

—কাপড় পাওয়া গেল না ?

রক্ষাকর জবাব দিলে না।

একজন বললে, কেন ? যেখানা পরে আছ, ওখানাই বা মন্দ কি ! আমাদের চেয়ে ঢের ফর্সা।

কথাটা মিথ্যা নয়। সত্যই যেখানা সে পরে আছে সেখানাও আমাদের কাপড়ের চেয়ে ফর্সা। কিন্তু তাতেও রক্ষাকর মাথা তুললে না, যদিচ সেখানা পরে গেলেও, ওর পদোচিত মর্যাদা ক্ষুণ্ণ হত না।

কিন্তু ও তা পারে না। আফিস যাওয়ার সময় ফর্সা কাপড় একখানা ওর চাই।

অবশ্য কাপড়খানা অবশেষে পাওয়া গেল। কতকগুলো খবরের কাগজের নিচে কে লুকিয়ে রেখেছিল। সুতরাং শেষ পর্যন্ত কাজে যাওয়া আটকাল না। তবে বোধ হয় একটু দেরি হল। কারণ এর পরে আবার একবার স্নো মাখার দরকার পড়ল।

রক্ষাকর যখন স্নো মাখছে, ঠিক সেই সময়ে বটুক ঘোষ পদভরে মেদিনী কাঁপিয়ে আকাশ পানে চাইতে চাইতে ছেলে পড়িয়ে ফিরলেন। প্রায় সবাই তো আফিসে চলে গেছে, সিঁড়ির ধাপে ধাপে জুতোর সমারোহ আর নেই। কেবল নিচে রান্নাঘরের পাশে একটা খালি বালতি ছিল, বটুক ঘোষের পা লেগে সেইটে সশব্দে উলটে পড়ল।

বটুক ঘোষ হাঁকলেন, এখানে একটা বালতি রাখলে কে ?

কেউ সাড়া দিলে না। তার প্রয়োজনও ছিল না। বটুক নিজেই সেটা কলতলায় যথাস্থানে রেখে উপরে উঠে এলেন। বাইরে থেকে যখনই তিনি ফেরেন, সোজা ছাদে গিয়ে জামা-চাদর রোদে মেলে দিয়ে তবে ঘরে ঢোকেন। তাতে রোগের বীজাণু মরে। আজও তার

বটুক পায়চারি করতে করতে বলতে লাগলেন, আপেল, নাশপাতি, বেদানা, কমলালেবু, কুল, রাবড়ি, মিষ্টি ··

—কোথায় মশায় ?

—দত্তদের ঠাকুরবাড়ীতে।

রক্ষাকর বিস্মিতভাবে বললে, সে আবার কোথায় ?

আকাশের দিকে আঙুল তুলে বটুক বললেন, কর্ণোয়ালিশ ষ্ট্রীটে। পড়িয়ে ফেরবার রাস্তায় পড়ে কি না। চমৎকার আয়োজন! নতুন হয়েছে। চমৎকার মন্দির! আপনাকে একদিন নিয়ে যাব।

রক্ষাকরের বিস্ময় ক্রমেই বাড়ছিল। বললে, সে কি মশায়! আপনার এ দেব-দ্বিজে ভক্তি কবে থেকে উথলে উঠল ? আপনি গুরুকে প্রণাম করেন না, আর ঠাকুর-বাড়ীতে রোজ যান প্রণাম করতে ?

—যাই কি সাধে মশাই, প্রসাদের জন্যে।

বটুক ঘোষ উচ্ছ্বসিত হয়ে হেসে উঠলেন। তাড়াতাড়ি বাইরে গিয়ে পাঞ্জাবীটা আর এক ইঞ্চি ডান দিকে এবং খদ্দরের গায়ের কাপড়টা এক ইঞ্চি বাঁ দিকে সরিয়ে দিয়ে ফিরে এলেন।

বললেন, ভক্তি ? এমন করে গলবস্ত্রে বসে থাকি যে, আমারই ওপর লোকের ভক্তি হয়। একদিন কোনো কারণে দৈবাৎ না যেতে পারলে মন্দিরের লোকেরা ব্যস্ত হয়ে ওঠে। কত কৈফিয়ৎ দিতে হয়! জানেন না তো ? দেখেন না, রবিবারে ছুটির দিনেও ঠিক সময়ে এখান থেকে বেরিয়ে পড়ি ? কামাই করার যো টি নেই।

বলে আর একবার হাসলেন।

রক্ষাকরের আর দেরি করার সময় ছিল না। কেবল মাথার টেড়িটা আর একবার বাগিয়ে নেবার অবসরে আর একবার স্নো মাথার প্রয়োজন আছে কিনা ভাবতে একটু দেরি করলে। অবশেষে স্নো না মেখেই বেরিয়ে পড়ল।

বটুক ঘোষেরও অনেক কাজ বাকি। জামা-কাপড় অসম্ভব রকম ময়লা হয়ে গিয়েছে। সাবান না দিলেই নয়। ভদ্রলোক পাঞ্জাবীটা আর একখানা কাপড় কাঁধে ফেলে কলতলায় নেমে গেলেন।

সাবান দেওয়া তাঁর আসে না। আমি ওপর থেকে দেখতে লাগলাম, যত না তিনি সাবান দেন, জিভ বার করেন তার চেয়ে বেশি। কোনো রকমে আল্‌গোছে কেচে, না নিংড়েই ওপরে মেলে দিতে এলেন। নেংড়ালে নাকি কাপড় ছিঁড়ে যায়।

বন্ধু, আমার প্রভাত-কাহিনীর এইখানে হল শেষ। যে ক'টি বান্ধবের কথা লিখলাম তাদের কেমন লাগল জানিও। কেবল একটি অনুরোধ আছে। এদের সম্বন্ধে বিচার করার সময়ে একটি কথা মনে রেখ। তোমার মস্ত বড় ড্রইং-রুমে যাঁরা পায়ের ধূলো দেন তাঁরা বাংলার প্রাণ। তোমার ড্রইং-রুমে তাই বাংলার প্রাণশক্তির পরিচয় পাই। আমার এখানে সে পরিচয় পাবে না ভাই। এরা বাংলার দেহ। ক্রমেই অসাড় ও দুর্বল হয়ে আসছে। স্বাভাবিক অবস্থায় এদের আশা-আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে তোমাদের আশা-আকাঙ্ক্ষার এবং এদের দুঃখের সঙ্গে তোমাদের দুঃখের যোগ-সূত্র থাকা উচিত ছিল। কিন্তু তা নেই।

যে সমাজ-ব্যবস্থা আমাদের ছিল, তা অর্থ-নীতিক ভিত্তির উপর উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল না। সেই ব্যবস্থায় যাঁরা ছিলেন চূড়ায়, তাঁরা ছিলেন দরিদ্রতম। তাঁদের শ্রেষ্ঠত্ব ছিল বিদ্যায় ও তপস্যায়। সেই ব্যবস্থা ভালো ছিল কি মন্দ ছিল, সে প্রশ্ন তুলে আজ আর লাভ নেই। আজ অনিবার্যভাবে সেই প্রাচীন সমাজ-ব্যবস্থা ভেঙে আসছে, অত্যন্ত দ্রুতবেগে। তাকে প্রতিরোধ করা এখন আর প্রায় অসম্ভব।

তার বদলে প্রতিষ্ঠিত হতে চলেছে অর্থনীতিক ভিত্তির উপর নতুন একটা সমাজ-ব্যবস্থা। আগেকার ব্যবস্থায় এই নিম্ন মধ্যবিত্ত শ্রেণীই ছিল সমাজের প্রাণ। কি রাষ্ট্র, কি শিক্ষা, কি শিল্প, কি বিজ্ঞান, কি সাহিত্য, কি ধর্ম, সকল ক্ষেত্রেই এদেরই দান ছিল সব চেয়ে বেশি। আজকে সামাজিক মর্যাদায় এরা নেমে আসছে। ধীরে ধীরে হাত মেলাতে চলেছে নিম্নতম স্তরের সঙ্গে।

এর ফল বাংলার জীবনক্ষেত্রে ভালো হবে কি মন্দ হবে, এখনই হয়তো তা নিশ্চয় করে বলার সময় আসেনি। কিন্তু ধরে নেওয়া যেতে পারে, এই মেসে ভাবী বাংলার সেই ইতিহাসের একটি পরিচ্ছেদ রচিত হচ্ছে। অদৃশ্য হস্তে লিখে চলেছেন মহাকাল। আমি দর্শক-মাত্র। পরম কৌতুক এবং কৌতূহলের সঙ্গে দেখে চলেছি সেই লিখন। তার বেশি নয়।

## ॥ দুই ॥

বন্ধু, তোমার অহঙ্কার আছে তুমি জীবন দেখেছ—বহু নর-নারীর জীবনলীলা, জীবন যেখানে লীলাকমলের মতো শতদলে বিকশিত হয়ে উঠেছে। সেখানে আকাশ গাঢ় নীল, ধরণী শস্যশ্যামল, স্বচ্ছ-সলিলা নদী চলেছে খরস্রোতে বয়ে। আমি দেখি মৃত্যুর অভিনব লীলা। এখানে আকাশ ধূমমলিন, ধরণী উষর, ধমনীর রক্তস্রোত ধীরে ধীরে ঝিমিয়ে আসছে। নবীন আশায় কারও চোখ মুহূর্তের জন্যেও উজ্জ্বল হয়ে ওঠে না।

স্বপ্ন? কোথায় স্বপ্ন! জীবন-দেবতা মৃত্যুর কোলে এলিয়ে পড়েছে।

এদের কথা ভালো লাগবে তোমার?

এই মেসের আমি নাম দিয়েছি "মধুচক্র"। কেউ জানে না, শুধু আমার দেওয়া নাম আমিই জানি। তুমি বলবে, নাম তো দিলে কিন্তু মধু কই? মধুও আছে। সে আমার মনে। এদের মধ্যে বড় আনন্দেই আছি। কিন্তু আমার আনন্দের কথা এখন থাক।

এই সময়টা ঘণ্টাখানেকের জন্যে আমি একলা থাকি। সাড়ে ন'টার পর থেকেই মেসের বাবুরা একে একে কর্মস্থানের উদ্দেশে ছুটতে থাকে। দশটার কিছু আগেই মেস একেবারে খালি। আমি একা, জানালার বাইরে যে একটুখানি দুর্লভ আকাশ তারই দিকে চেয়ে থাকি।

ক'টি চড়ুই পাখী দেওয়ালের ফাঁকে ফাঁকে বাসা বেঁধেছে, তাদের কিচমিচ শুনি। মাঝে মাঝে শঙ্খচিলের শীর্ণ তীক্ষ্ণ আওয়াজ

ভেসে আসে। আকাশ-পথে দু'একটি পাখী মন্থর আলস্যে অকারণে ভেসে বেড়ায়।

পাশের বাড়ীতে সেই বেকার ছোকরাটি বায়োস্কোপ দেখতে যাওয়ার হুজুগ এনেছে। হুজুগ তো নয়, যেন দুর্ভিক্ষ পীড়িত জনতার কাছে মুষ্টি-ভিক্ষা এনেছে। ও-বাড়ীতেও এখন পুরুষ বলতে কেউ নেই, বাদে এই ছোকরাটি। মেয়েদেরই রাজত্ব। এক সঙ্গে সবাই কলরব করে উঠল

—যাব, যাব, যাব।

প্রথমে সবাই চেঁচিয়ে উঠল, যাবে, যাবে, যাবে। সবাই যাবে, তিন বছরের ছেলেটি থেকে তিরাশী বছরের বুড়ী পর্যন্ত। তারপরে উঠল টাকার প্রশ্ন। কথাটা প্রথম ঝোঁকে কেউ ভেবে দেখবার সময় পায় নি। ভাবতেই দমে গেল।

—টাকা কোথা পাব? টাকা ফল্‌ছে।—তরুণীর কণ্ঠস্বর।

—ফলছে কি? কাল তোর বর এসেছিল, তোর হাতে টাকা নেই? আমাকে এমনি বোকা পেয়েছিস?—এবারে সেই বেকার ছোকরার ঝন্‌ঝনে আওয়াজ।

—বেশি বাজে বকিও না ছোড়দা। আমি যাব না যাও। আমার হাতে একটি পয়সা নেই। দিয়ে-থুয়ে তো রাজা করে রেখেছেন! আবার দাদা? লজ্জা করে না!

ছোড়দা এত বড় অপবাদেও কিছুমাত্র লজ্জিত হল বলে মনে হল না। বরং গলায় একটু রস মিশিয়ে বললে, আমার চাকরী হোক তখন দেখিস।

—আমার দেখে কাজ নেই।

—নেই তো নেই। দে দিকি পাঁচটা টাকা। চট্‌পট্‌ দে। নইলে পরে আর টিকিট পাওয়া যাবে না।

—না যাক।

—আহা !—এবারে বৃদ্ধার ঝাঁঝালো কণ্ঠস্বর—একবারে ঠেকরে ঠেকরে চলেছেন ! তুই দিবি না কে দেবে লা ছুঁড়ি ? তোর আছে তাই চাইছে। আমাকে তো চাইছে না।

—কেন তুমি দাও না। ও দেবে কেন ? তুমি দাও।—আর এক বৃদ্ধার কণ্ঠস্বর—মেয়ের কাছে টাকা চাইতে লজ্জা করে না? অ মা!

তুমুল ঝগড়া লেগে গেল। আলসের আনাচে কানাচে কতক-গুলি পায়রা পাখায় ঠোঁট গুঁজে ঝিমুচ্ছিল। আচমকা এত লোকের চীৎকারে চমকে উঠে তারা ঝট্‌পট্‌ করে উড়ে পালাল। দেখলাম, কাক বড় সেয়ানা। আমাদের দু'বাড়ির মাঝের দেওয়ালে বসে একটা কাক কি একা জিনিষ নখে করে ধরে ঠোঁট দিয়ে ছিঁড়ছিল। প্রথটা ভয় পেয়ে সে একবার পক্ষ বিস্তার করেই আড়চোখে চেয়ে দেখে নিলে, ব্যাপারটা সম্পূর্ণ অহিংস। সে আবার আপন কাজে মন দিলে।

কিন্তু আমি অত সহজে নিষ্কৃতি পেলাম না। বাক্যের ঝড় আর তর্কের ধূলো আমার মস্তিষ্কে তখন রণ-কুয়াশা সৃষ্টি করেছে। মনে হল, দেহের আর সব লাইন বন্ধ হয়ে গেছে, একমাত্র যোগ রয়েছে কানের সঙ্গে মস্তিষ্কের। সেখানে টেলিগ্রাফ যন্ত্রের মতো কেবল বেজে চলেছে :

অ মা···দরদ দেখে বাঁচিনে···

আমার কাপড়খানা কোথায় গো ··

লজ্জা-ঘেন্না কি আছে ? তারাও দেশ ছেড়ে পালিয়েছে ··

ওরে আমার দরদীরে···

নেকী ! কিছু তো জানেন না···

আঃ থাম না বাপু। হয়েছে···

দেবে বই কি, আছে দেবে না ··

ভারী তো টাকা! অমন টাকার মুখে·

ভাবছিলাম,

কি ভাবছিলাম জানিনে। অনেক কথাই ভাবছিলাম নিশ্চয়। ও বাড়ীর কোলাহল অনেকক্ষণ পর যখন থেমে গেল তখন মনে একটি চমৎকার প্রশান্তি এসেছে, ঢাকের বাদ্য থামলে যেমন হয়। সেই শান্ত মুহূর্তে মনে হচ্ছিল, অনেক অজানা জানা হল, আর কত জানা ছবি গেল হারিয়ে।

বহুকালের সেই ছোট্ট পল্লীভবন, তুলসীমঞ্চ, দীপালোকে মায়ের স্নিগ্ধ চোখ কই মনে পড়ে! কই আর মনে পড়ে, ছেলেবেলায় পাঠশালে সেই হুড়োহুড়ি, বটের ছায়ায় নামতা পড়া।

শীতের দুপুর, দুপুর বলেই মনে হয় না।

এগারটা বাজে নিশ্চয়, কি বেজে গেছে। কিন্তু মনেই হয় না বেলা হয়েছে। জানালার কাছে একফালি রোদ এসেছে। তারও তেজ নেই তেমন।

সেইখানে পিঠ দিয়ে অর্কসেবন করছিলাম। একটু গরম জল হলে স্নানের সুবিধা হয়। যেখানে স্নানের চৌবাচ্চা, দিনের কোনো সময়েই সেখানে রোদ আসে না। জল স্পর্শ করা দূরের কথা, চৌবাচ্চার ধারে দাঁড়ালেই হাড়ের ভেতর পর্যন্ত কেঁপে ওঠে।

কিন্তু গরম জলের ব্যবস্থা হওয়া অসম্ভব। উনুনের আঁচ কি আর আছে? এখানে এক টুকরো কয়লা বাজে খরচ হওয়ার পাঠ নেই। আর যদি বা কোনো প্রকারে ব্যবস্থা করা যায়, কে এই নিয়ে বিকেলে কুরুক্ষেত্র করে! তার চেয়ে অর্ক-সেবনেই যতটা হয়।

সিঁড়িতে দুম্‌দাম্‌ পায়ের শব্দ পাওয়া গেল।

খালি পায়ে এমন করে ঠাকুর ছাড়া আর কেউ আসে না। বোধ

হয় স্নানাহারের তাগিদ দিতে আসছে। ভেবে আমি কেবল মনে মনে বিরক্ত হয়ে উঠছিলাম, কিন্তু ঠাকুর যে ভাবে ঘনিষ্ঠ হয়ে আমার কাছে ঘেঁসে বসল তাতে আশঙ্কা দূর হল।

—কি খবর ঠাকুর মশাই ?

উড়িয়া ঠাকুর।

যক্ষ্মা রোগীর মত শীর্ণ, হাড়-বের-করা চেহারা। মাথার চুল ছোট-ছোট করে ছাঁটা। মধ্যস্থলে সুপুষ্ট শিখা। বয়স হয়েছে। সুমুখের ক'টি দাঁতই ভেঙে গেছে। যে ক'টা আছে তাও আর দাঁত বলে চেনবার উপায় নেই। মনে হয়, মাড়িতে কতকগুলো তরমুজের বিচি আটকে গেছে। পান খেয়ে এমন অবস্থা হয়েছে।

ঠাকুর আমার কথার উত্তর না দিয়ে কীর্তনীয়ার ঢঙে হাঁটু গেড়ে বসল। তারপর, যেন অত্যন্ত সতর্কভাবে, প্রসারিত বাঁ হাতের তালুর ওপর ডান হাতের তর্জনী আর মধ্যমা আঙ্গুলের ডগা ঠেকিয়ে গম্ভীর-ভাবে আমার দিকে চাইলে।

বললে, বাবু সকল গরুর মাথায় টিক্ থাকে না।

—থাকে না ?

—না। লাখো গরুর মধ্যরে একটির মাথায় থাকে। এ মেসে বাবু বলিতে আপুনি।

অর্থাৎ আমিই একমাত্র গরু যার মাথায় টিকা আছে! যাইহোক, ব্যাপারটা বোধগম্য হল। বিশেষ কারণে সম্প্রতি একমাত্র আমাকেই ঠাকুর মশায় বাবু ঠাউরেছেন। এবং সকলের মধ্যে আমার কপালেই টিকা আবিষ্কার করেছেন।

বললাম, কি হল ?

—কিছু না —বলে ঠাকুর নিশ্চেষ্টভাবে বসে রইল।

মিনিট পাঁচেক আমাকে দ্বিধায় ঝুলিয়ে রেখে ঠাকুর বললে, আপনি মনিব, মোর বাপ অছি। দু'টি কথা আপনাকে বলিব।

—বলুন।

এ মেসে ঠাকুরকে তুমি বলার পাঠ নাই, 'আপনি' বলি। জাত্যংশে ব্রাহ্মণ তো বটে। আর কর্ম? তা ভাতরাঁধা কি ডাইং ক্লিনিং-এর দোকানে কাজ করার চেয়ে খারাপ?

ঠাকুর বললে, কেষ্টা মুনিব অছি, কি চাকর অছি?

এ আবার কি প্রশ্ন!

বিস্মিতভাবে বললাম, চাকর অছি!

—এই কথা আর কিছু নয়।

বলে ঠাকুর যেমন ধুঁকতে ধুঁকতে এসেছিল, তেমনি ধুঁকতে ধুঁকতে নেমে গেল।

এত বড় একটা গুরুতর প্রশ্ন করবার জন্যে কেন কষ্ট করে জরা-জীর্ণ দেহ ওপর পর্যন্ত টেনে এনেছিল সেই জানে।

ব্যাপারটা কি হতে পারে বিস্মিতভাবে ভাবছি, এমন সময় দাসুর কণ্ঠস্বর:

এই যে! বসে আছেন? বেশ আছেন মশাই! হা-হা-হা।

চমকে উঠলাম।

দাসুবাবু সিঁড়ির মাঝখানে দাঁড়িয়ে জুতোর ফিতে খুলতেলাগল।

দাসুবাবুর বয়স বেশি নয়। ছেলেও ভালো। নানা কারণে স্কুলের পড়া অসময়ে সাঙ্গ করে বছর খানেক আগে কলকাতায় আসে অর্থোপার্জনের চেষ্টায়। বহু কষ্টে গড়পাড়ের দিকে একটা মদের দোকানে কাজ মিলেছে। সকালে বেরিয়ে যায়, এগারোটায় ফেরে। আবার দু'টোয় বেরিয়ে যায়, ফিরতে রাত ন'টা-দশটা।

দাসু কথা বেশি বলে না, কেবল হা হা করে হাসে। আর যতটুকুও বা কথা বলে, হাত নাড়ে তার চেয়ে বেশি। মাথা নাড়ে আরও বেশি, আশী বছরের বুড়োর মতো। ওই থেকেই কি বলতে চায় বুঝে নিতে হবে।

বললে, দাদা ফেরেনি তো ?

দাদা মানে অবধূত। দাস্থর মাসতুতো ভাই। রেলে কাজ করে। বিকেল তিনটে থেকে রাত দশটা পর্যন্ত কাজ।

ঘাড় নেড়ে বললাম, ফেরে নি।

দাস্থ গায়ের নীল রঙের আলোয়ানটা আর ছাই রঙের গরম কোট আলনায় টাঙিয়ে রাখলে। গেঞ্জিটা বাইরে ছাদে রোদে দিলে।

মাথা নেড়ে বললে, আচ্ছা লোক বটে! পাছে সকালে খেতে হয় বলে ন'টার সময় বেরিয়ে যাবে। হা-হা-হা।

দাস্থ মাথা দোলাতে দোলাতে নেমে গেল। একটু পরেই নিচে বাঁয়া-তবলার শব্দ পাওয়া গেল।

দাস্থর বাজনার সখ আছে, সময় নেই। এই সময় আধ ঘণ্টাটেক বাজিয়ে হাতের আড় ভেঙে নেয়। কিন্তু ওর শত্রু অনেক। গোবর্ধন তো প্রথম নম্বর।

গোবর্ধন কর্পোরেশনে রাস্তা সম্পর্কে কি কাজ করে। সন্ধ্যে হতে না হতে ঠাকুরকে খাওয়ার তাগিদ দেবে। সকলের আগে খাওয়া সেরে, মাথার কাছে একটা দেশলাই রেখে, আপাদমস্তক একটা রাগ মুড়ি দিয়ে ঘুমুবে।

তারপর সবার যখন ঘুম আসবে, ও তখন একবার করে দেশলাই জ্বালবে আর ঘড়ি দেখবে। চারটের সময় ওর বোধ হয় কাজ আরম্ভ।

আগে দেশলাই রাখত না, ঘড়িও ছিলনা। কিন্তু একবার অন্ধকারে কাজে বেরোবার সময় দাস্থর মাথায় পা দেওয়ায় ভীষণ গোলমাল বাধে। তারপর অনেক খরচ কমিয়ে ঘড়ি কিনতে বাধ্য হয়েছে। দেশলাইও একটা করে রাখে।

ছোটখাটো মানুষটি।

খুট খুট করে আসতে আসতে তবলার আওয়াজ পেয়ে বললে, বাবা, ও ঢেঁড়ি পিটোনো রাখ। খেয়ে-দেয়ে নিয়ে একটু সুস্থ হয়ে শোও বরং।

দাসু তবলায় একটা তেহাই দিয়ে বললে, এই যে ড্রাইভার এসেছে! তিনটের সময় গাড়ি ঠিক করে রেখ। আমাকে বেরুতে হবে।

এইটে ওদের দু'জনের মধ্যে মামুলী সম্ভাষণ বিনিময়!

দাসুর তবলা-বাজানোকে গোবর্ধন বাদ্য বলে আমল দিতে চায় না। ওটাকে সে ঢেঁড়ি-পোটার সগোত্র বলে মনে করে। পক্ষান্তরে, যে-গাড়ি নেই, যার আশাও দাসুর দূরতম কল্পনাতেও নেই, গোবর্ধনকে দাসু তার সেই নিতান্ত কাল্পনিক গাড়ির ড্রাইভার বানিয়েছে!

গোবর্ধন সিঁড়ি দিয়ে উঠতে উঠতে বললে, গাড়ি দেখছ কখনও?

সঙ্গে সঙ্গে পিছনে দুপ দুপ শব্দ শুনে ফিরে তাকিয়ে বললে, কোথায় গিয়েছিলেন মশাই? খান নি যে এখনও? ওহে দাসু, আজ বটুক বাবুর হল কি? এগারোটা বেজে গেছে এখনও বটুক বাবুর খাওয়া হয়নি?

বটুক ঘোষ পাশ কাটিয়ে চলতে চলতে বললেন, কাজ থাকলে এক-আধদিন দেরি হয় মশাই।

বটুক ঘোষের কাজ ছিল।

কোথায় একটা ট্যুইশান খালি পড়েছে তার সন্ধান নিতে গিয়েছিলেন। নইলে ব্রহ্মাণ্ড উলটে গেলেও দশটার মধ্যে খাওয়ার অন্যথা হয় না।

বটুক ঘোষ তখন যেভাবে ছাদে মাদুর, বালিশ, চাদর, জামা রোদ্দুরে দিলেন, ভেবেছিলাম আর কোথাও ভদ্রলোক বেরুবেন না।

তারপরে কখন আবার জামা গায়ে দিয়ে বেরিয়ে গিয়েছিলেন টের পাইনি।

ভদ্রলোকের বেশের বাহাদুরী আছে। কাপড় যত লম্বাই হোক, এমনভাবে পরবেন যাতে হাঁটুর নিচে না নামে। ডান দিকটা যদি একটু নামে, কোঁচা পকেটে গুঁজলেই সে ক্রটি শুধরে যায়। তার ওপর একটা লম্বা ঝুলের খয়ের রঙের পাঞ্জাবী। এক জোড়া জুতোও আছে। এখনও মনোযোগের সঙ্গে লক্ষ্য করলে বোঝা যায় আদিতে তার রং ব্রাউন ছিল।

বটুক ঘোষ কেমিষ্ট্রীতে অনার্স নিয়ে বি, এস-সি পাশ করেছেন আজ বছর বারো হল। এখনও পর্যন্ত কোনো স্থায়ী কাজের যোগাড় হয়নি। দু'বেলা দুটো ট্যুইশান করেন। দুপুরে আর একটা যদি পাওয়া যায় সেই চেষ্টায় বাইরে গিয়েছিলেন।

জিগ্যেস করলাম, কি হল ?

খাওয়ার তাড়াতাড়ি আছে। বটুকবাবু সংক্ষেপে উত্তর দিলেন, সুবিধে নয়।

পাঞ্জাবীটা আলনায় মেলে দিয়েই তাড়াতাড়ি নিচে ছুটলেন। কিছুকাল থেকে ম্যালেরিয়ায় ভুগছেন, সুতরাং স্নানের বালাই নেই। গামছা প'রে কাপড়টা কেচে আর ওপরে তোলেন না। তাতে অনাবশ্যক খানিকটা সময়ের অপব্যয় হয়। সময় সম্বন্ধে ভদ্রলোক অত্যন্ত সতর্ক। গামছা প'রেই খেতে বসলেন।

বটুক ঘোষের খাওয়াও একটা দেখবার ব্যাপার। এক মিনিটের বেশি লাগে না। ভাতে ডালে মাখা আর সঙ্গে সঙ্গে গলাধঃকরণ। চর্বণের পণ্ডশ্রম নেই।

সুতরাং দেখতে দেখতে বটুক ঘোষ আহারাদি সেরে ফিরে এলেন। কাপড়টা বাইরে মেলে দিয়ে, এক খাবলা মসলা মুখে দিয়ে জাবর কাটতে লাগলেন।

গোবর্ধন বললে, না দেখেই খেলেন তো? ওর মধ্যে ছারপোকা থাকে জানেন?

নিশ্চিন্তভাবে মেঝেয় মাদুরটা পাততে পাততে বটুক বললেন, থাক না। রাতকানা হবার ভয় থাকবে না। কতদিন খেয়েছি।

ছারপোকা খেলে যে রাতকানা হবার ভয় থাকে না, এত বড় বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের ক'জন খবর রাখে?

বটুক একখানা খবরের কাগজ খুলে বসলেন।

আমরা নিচে স্নান করতে নামছি এমন সময় অবধূত এল।

—এত করে জল নষ্ট করিস না। নাইতে হবে, এখনও অনেককে নাইতে হবে।...এখানে মগটা রাখলে কে? এখুনি যাবে বটুকবাবুর পায়ে লেগে।...আবার এইখানে দরজার সামনে ঝাঁটা রেখেছিস? এ ছোঁড়াকে একদিন এমন প্রহার দোব...

এটা অবধূতের বাতিক,—জল আর ঘর-পরিষ্কার।

এ মেসে কলের জল যে কম আসে তা নয়। তার নিজের স্নান এবং কাপড়-চোপড় সাবান দেওয়ার জলের অভাবও বড় একটা ঘটে না। অথচ সব সময়েই তার আশঙ্কা জল ফুরিয়ে যাবে। তার স্নানের জল থাকবে না। কিংবা যদি কাপড়-চোপড়ে সাবান দিতে হয়, তাহলে জলের অভাব ঘটবে। সুতরাং প্রাতর্ভ্রমণ সেরে বারোটা-একটায় যখন সে ফেরে, তখন প্রথমেই উদ্বেগের সঙ্গে দৃষ্টি দেয় জলের চৌবাচ্চার দিকে। এবং তার আশে-পাশে কাউকে দেখলেই জলের সদ্ব্যবহার সম্বন্ধে সতর্ক করে দেয়। বোধ করি তার অবচেতন মনে এই বিশ্বাস বদ্ধমূল হয়ে আছে যে, কলকাতা কর্পোরেশনের জলের কল একমাত্র তারই জন্যে খোলা হয়েছে এবং একমাত্র তারই স্নান এবং অন্যান্য আবশ্যক-অনাবশ্যক প্রয়োজন সাধনেই তার যথার্থ সদ্ব্যবহার।

ঘর-পরিষ্কার সম্বন্ধেও এমনি কথা বলা চলে।

কেষ্টার অনেক দোষ সন্দেহ নেই। প্রয়োজনের সময় তাকে পাওয়া যাবে না। নতুন নতুন কৈফিয়ৎ আবিষ্কারে সে অতুলনীয়। সে অবাধ্য। তার কাজের একটা পদ্ধতি আছে। যে যতই বকুক সেই পদ্ধতির ব্যতিক্রম সে সহজে করে না। এ সমস্তই সত্য। কিন্তু নিজের সময়মতো নিজের কাজ সে ঠিক করে যায়। সেই সময়টিতে ঘরও সে ঠিক ঝাঁট দেয়।

আর ঘর মানে তো একখানি ঘর আর তার সামনেই একফালি বারান্দা আর সিঁড়ি। তাতে কতক্ষণই বা লাগে!

কিন্তু অবধূতের ধারণা ঘর সে পরিষ্কার করে না। করলেও ভালোমতো পরিষ্কার করে না! ধুলা-বালি কিছু কিছু থেকে যায়। সুতরাং দিন অথবা রাত্রির যে সময়েই সে আসুক,—যত বেলায় অথবা যত অবেলাই হোক,—নিজের হাতে একবার ঝাঁট না দিলে সে পরিচ্ছন্নতা সম্বন্ধে নিঃসংশয় হতে পারে না।

কিছুদিনের চর্চায় এটা অভ্যাসে দাঁড়ায়। আরও কিছু দিনের চেষ্টায় এখন এটা বাতিকে পরিণত হয়েছে!

—এসেই ফুদ্ ফুদ্ আরম্ভ করেছেন তো?—দাসু বললে।

—তোমাদের কি? তোমাদের কি? খালি খাওয়া আর শোয়া। মেসের কি হচ্ছে না হচ্ছে সে তো আর দেখবে না?

অবধূত আপন মনে বিড় বিড় করতে করতে ওপরে চলে গেল। চাকরের জল নষ্ট করার কাজ আগেই শেষ হয়েছিল, এবারে আমাদের আর একবার সে কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে গেল।

গোবর্ধন ঝাঁঝের সঙ্গে বললে, শীগগির যদি এস তো জল পাবে, নইলে পাবে না। খালি জল নষ্ট হবে, জল নষ্ট হবে!

কিন্তু শাসানি যত বড়ই হোক, বাতিক তারও চেয়ে বড়। সুতরাং গোবর্ধনের শাসানি সে গ্রাহ্যের মধ্যেই আনলে না।

গায়ের পাঞ্জাবীটা খুলে ছাদে রোদে মেলে দিয়ে এল। শুকনো গামছাটা দিয়ে সর্বাঙ্গ মুছলে। তারপর ঝাঁটাটা নিয়ে ঘর ঝাঁট দিতে বসল।

দাস্থ বললে, এমন গেঁতো ভূ-ভারতে পাবে না।

গেঁতো বটে! আমরা স্নান সেরে যখন খাওয়ার জন্যে নিচে নামছি, ও তখন ঘর পরিষ্কার সেরে সিঁড়ি ঝাঁট দিচ্ছে। এর পরে স্নান করবে, হয়তো ছ'একখানা কাপড়-জামায় সাবানও দেবে। তারপরে খেতে বসবে!

অবধূতের জন্যে অপেক্ষা করে লাভ নেই। ওর এখনও অনেক দেরি। আমরা তিনজনে খেতে বসলাম,—আমি, গোবর্ধন আর দাস্থ।

ঠাকুর আমাদের সকলকে এনামেলের থালায় যত্ন করে ভাত বেড়ে দিলে।

দাস্থ আমাকে বললে, আপনি জানেন না বোধ হয়, ঠাকুর আমাদের খুব পণ্ডিত লোক। গীতগোবিন্দ কণ্ঠস্থ। গোড়া থেকে শেষ পর্যন্ত।

ঠাকুর সবিনয়ে বললে, না না বাবু, পণ্ডিত নই। পণ্ডিত কাহাকে বলে? তবে সময় পাইলে কিছু কিছু লিখাপড়া করি, এই আর কি।

বলে সস্মিত দৃষ্টিতে সকলের দিকে চাইলে।

গোবর্ধন জিগ্যেস করলে, ঠাকুর মশাই, শাকে বুঝি ঘি দিয়েছেন?

ঠাকুর সহাস্যে বললে, টিকে দিউছি। কুলাক-না কুলাক সবেতে টিকে টিকে ঘি দিই।

—বেশ! বেশ!—আমি পুলকিত হয়ে উঠলাম। বললাম, দেবেন, দেবেন। ঘি না দিলে

ঠাকুর সোল্লাসে হাতা উঁচিয়ে বললে, হ্যাঁ, 'টেস' হয় না। টিকে ঘি

বললাম, দেবেন। না কুলুলেও ঘি একটু দেবেন। 'টেস' হবে। আপনার পেঁপের তরকারীটা তো চমৎকার হয়েছে। আছে আর? দিন তো একটু।

আহ্লাদে ঠাকুরের মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। তার মনোহর রান্না সাধারণত কেউ চেয়ে খায় না। কিন্তু এক চামচ তরকারী তুলেই থমকে দ্বিধাভরে বললে, আজ্ঞা, এটা পপেয়া নয়, লাউ অছি।

—লাউ? তাহলে থাক। আমি ভেবেছিলাম···যাকগে, তাহলে বরং ফুলকপির তরকারীই একটু দিন।

—টিকে নিবেন না?

—না, কম পড়ে যাবে হয়তো। বরং ফুলকপিই দিন। ওটাও খুব চমৎকার হয়েছে।

ঠাকুর সে তরকারীটা নামিয়ে রেখে বিস্মিতভাবে বললে, আজ্ঞা ফুলকপি তো নাই!

—নাই?—একটা তরকারীর দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে বললাম, —এটা কি তাহলে?

—ওইটা?

ঠাকুর একটা চামচ দিয়ে সেই তরকারী খানিকটা তুলে একগাল হেসে বললে, ওটা বঁধাকপি।

বাঁধাকপি! আমি ভাবছিলাম···ঠিক ফুলকপির মতো 'টেস'। বাঃ থাক, থাক, আর দেবেন না। আপনার জন্যে রইল কি?

ঠাকুর ঠোঁট উলটে পরম ঔদাস্যভরে উত্তর দিল, আমি কি ওই খাই বাবুমশাই?

খায় না! তাতেই...

বললাম, খান না?

ডান হাতের চামচখানা নেড়ে বললে, না। টিকে ভাত নিই, দুই পয়সার দহি আনি, ব্যস।

দাস্যু বললে, লোভ নেই যে! লোভ একেবারে নেই।

ঠাকুর এবার চোখ পাকিয়ে হাতা উঁচু করলে। রাগে নয়, অনুরাগে সুর করে বললে:

বিপিনের পীণ উরজা
অপূর্ব দ্রব্য দেখি ন মাগিবু।
বিনা সহোদর মধ্যরে অন্দর
বিপথকু করি থিবু গো-ও-ও।

তারপর নিজেই তার ব্যাখ্যা করতে লাগল :

মানে কি ? কৌশল্যা বলিছন্তি। কাকে ? সীতাকে। কি বলিছন্তি ?

দাস্যু মাথা নেড়ে বললে, বেশ, বেশ !

কিন্তু শেষ রক্ষা করতে পারলে না। একেবারে হো হো করে অট্টহাস্য করে উঠল।

ঠাকুর রাগে গড় গড় করতে করতে হাতা দিয়ে অকারণে ডাল নাড়তে লাগল। তারপর আড়চোখে আমার দিকে চেয়ে বাঁ-হাতের তর্জনী তুলে বললে, আপনাকে তখনই বলেছি বাবু, সকল গরুর মাথায় টিক্ থাকে না।

বললাম, হ্যাঁ। যা বলেছেন !

ঠাকুর এক দিকের ওষ্ঠপ্রান্ত কাণের কাছ পর্যন্ত প্রসারিত করে অপূর্ব ভঙ্গিতে হেসে হেসে মাথা নাড়তে লাগল।

আহারান্তে বিছানাটা পেতে একটু গা গড়াবার আয়োজন করছি, হাবুল এল।

হাবুল কলেজে পড়ে। ফর্সা, দোহারা চেহারা মাথার চুল থেকে পায়ের চটি পর্যন্ত আপ্-টু-ডেট। আগে কিছুদিন এই মেসে ছিল। এখনও মায়া কাটাতে পারেনি। প্রত্যহ এই সময় একবার করে আসে। না এলে মুস্কিল হত, এই কোটরে বসে বাইরের জগতের কোন খবরই পাওয়া সম্ভব হত না। হাবুলের এই একটি গুণ আছে, সমস্ত কলকাতা শহরটা ঠুক ঠুক করে পায়ে-পায়ে একবার ঘুরে না এলেই নয়। নইলে ভাত হজম হয় না।

গোবর্ধনের সঙ্গেই ওর ভাব বেশি। জানালায় তো ছিট্‌কিনির বালাই নেই। একটা ভারী কাঠের হুড়কো আছে, রাত্রে সেইটে জানালায় কোণাকুণি ঠেকা দেওয়া হয়। গোবর্ধন বেচারা অত্যন্ত ঘুমকাতুরে। আড়াইটার সময় ফের তাকে বেরুতে হয়। তবু ইতিমধ্যে একবার,—যতক্ষণের জন্যেই হোক—ত্বপুরে একটু নিদ্রা দেওয়াই চাই। এটা তার বিলাস।

গোবর্ধন খেয়ে এসেই আপাদমস্তক রাগ মুড়ি দিয়েছিল। হাবুল এসে সেই ভারী কাঠখানা নিঃশব্দে দিলে তার বুকের ওপর চাপিয়ে। গোবর্ধন চমকে লাফিয়ে উঠল। চট্‌বার উদ্যোগ করছিল, কিন্তু হাবুলের মুখের হাসি দেখে আর চটতে পারল না। আপনার শীর্ণ বিছানায় কাৎ হয়ে তার জন্যে একটু স্থান করে দিলে। তার ধারণা বিশ্বশুদ্ধ সকলেই তার মতো একটু ঘুমুতে চায়। অন্তত শুতে।

হেসে বললে, এই যে, হাবুলচন্দ্র! তা নইলে আর কে হবে! শোও।

বটুক ঘোষ খবরের কাগজ থেকে মুখ তুলে জিগ্যেস করলেন, কি খবর?

গোবর্ধনের বিছানায় বসে হাবুল বললে, কাল বিদ্যোদয় গার্লস্‌ স্কুলের থিয়েটার আছে। ইউনিভারসিটি ইন্‌সটিট্যুটে। সন্ধ্যে ছ'টায়। যাবেন?

—টিকিট পেয়েছেন নাকি?

—যোগাড় করলাম। আমার এক ফ্রেণ্ডের মামা ওদের স্কুলের মাষ্টার। ভবানীপুরে থাকেন। তার কাছ থেকে বাগালাম। এই ফিরছি সেখান থেকে।

—ক'খানা টিকিট পেয়েছেন?

—তুখানা। বালীগঞ্জ গেলে আরও একখনা পেতে পারতাম। আমার ছাত্রের ভগ্নিপতি আবার ওদের স্কুলের মেম্বার কিনা। যাবেন আপনি?

খবরের কাগজ ভাঁজ করতে করতে বটুক উৎসাহের সঙ্গে বললেন, তা আবার যাব না কেন?

একটু খুঁৎ খুঁৎ করে হাবলু বললে, ওরা কিন্তু তেমন ভাল করে না। গেলবারেও গিয়েছিলাম কি না।

বটুক মাথার দিকের তাকে খবরের কাগজগুলো রাখবার জন্যে উঠে দাঁড়াচ্ছিলেন, দাসু হাঁ হাঁ করে বাধা দিয়ে বললে, উঠবেন না, উঠবেন না। কাপড়টা পরুন আগে।

বটুক কাপড়ের দিকে দৃষ্টি দিয়ে দাসুর উক্তির সারবত্তা উপলব্ধি করলেন। কিন্তু কিছু বললেন না।

কাপড়টা সামলে নিয়ে বললেন, বিনা পয়সায় যাব মশাই, ভাল আর মন্দ। ভিড়ের মধ্যে দাঁড়িয়ে রাস্তার রেডিও শোনার চেয়ে তো ভালো। তাহলেই হল।

হাবলু বললে, বিষ্যুৎবারে ভালো থিয়েটার আছে। বাগবাজার নাট্যসমাজের। মিনার্ভায় হবে। দেখেছেন? দেখেননি? Marvel-lous। পুরুষে যে অমন মেয়ের পাঠ করতে পারে, না দেখলে বিশ্বাস হয় না।

একটু চুপ করে থেকে আবার বললে, পারি খান কয়েক টিকিট বাগাতে। কিন্তু হাঁটতে হবে অনেক মশাই,—টালা পর্যন্ত। সে অনেক ঝামেলা।

—তা যান না কেন ঠুক ঠুক করে। টালা আর কতদূর?—বটুক ঘোষ বিরক্তভাবেই বললেন। আলস্য তিনি সহ্য করতে পারেন না।

—দেখি তো।

হাবলু বোধ হয় মনে মনে ভাবতে লাগলো, এই সামান্য মাইল ছয়েক পথ যাবে, কি যাবে না।

বটুক বললেন, আর ক্যালেণ্ডার? আমার সেই ক্যালেণ্ডারের কি করলেন?

—এই যে সেদিন কোথা থেকে নিয়ে এলেন মশাই, অনেকগুলো।

—অনেকগুলো আবার কোথায় দেখলেন?

– অনেকগুলো বই কি! এক গাদা দেখলাম যেন।

—একগাদা আবার কখন দেখলেন? মোটে তো খান কুড়ি যোগাড় হয়েছে।

—তবে?

উষ্মার সঙ্গে বটুক বললেন, তবে আবার কি মশাই! চাই যে চল্লিশখানা।

বিস্মিতভাবে হাবলু জিগ্যেস করলে, চল্লিশখানা নিয়ে কি করবেন?

—করব আবার কি? ছবি তো বটে, টাঙ্গিয়ে রাখব। দেবেন কিনা বলুন।

—আচ্ছা দোব একখানা। কিন্তু আবার হ্যারিসন রোড পর্যন্ত হাঁটতে হয়।

গম্ভীরভাবে বটুক ঘোষ বললেন, ওই তো আপনাদের দোষ। একটু হাঁটতে হলেই পিছিয়ে যান। ইয়ংম্যান আপনারা, হাঁটতে ভয় পেলে চলবে কেন? আমার দেখুন না,

কিন্তু কথাটা আর শেষ করতে পারলেন না। হঠাৎ চমকে থেমে গেলেন।

শুধু তিনি নন, অকস্মাৎ নিচে একটা কোলাহল শুনে আমরা সবাই চমকে উঠলাম।

অবধূতের গলা যেন।

অবধূত নিজের মনে কি বিড় বিড় করে বকে, কিন্তু উত্তেজিত হয়ে বড় একটা চিৎকার করে না। ঠাকুরও কিছু যেন উত্তেজিতভাবে বলছে না? কি হল আবার!

বটুক ঘোষ জানালা দিয়ে উঁকি মেরে ব্যস্তভাবে বললেন, এই দেখুন, আবার কি ফৈজৎ!

বটুক যেভাবে তাড়াতাড়ি নেমে গেলেন, তাতে আমরাও আর নিশ্চেষ্টভাবে বসে থাকতে পারলাম না।

নিচে গিয়ে দেখি, উত্তেজনার আধিক্যে অবধূত পিঁড়ির ওপর সোজা হয়ে উঠে দাঁড়িয়েছে। ওর খাওয়া তখনও শেষ হয় নি। এমনিতেই ওর কথা জড়ানো, বুঝতে কষ্ট হয়। তার ওপর রেগেছে। এঁটো ডান হাতখানা নেড়ে নেড়ে ও যে কি বলছে, এক বিন্দুও বুঝলাম না।

আর ঠাকুর? ঠাকুর দাঁড়ায়নি বটে, কিন্তু সেও উত্তেজিত কম হয়নি। কোমরে ফিক্ ব্যাথার জন্যে ঠাকুর তাড়াতাড়ি দাঁড়াতে পারে না। পিঁড়ির ওপরে বসেই উত্তেজনায় এক একটা কথা বলবার চেষ্টা করছে। কিন্তু বিধি বিরূপ, কাশির ধমকে শেষ করতে পারছে না।

—কি হল কি? আরে হল কি তাই বলুন না! চেঁচাচ্চেন তো খুব।

বটুক ঘোষ মধ্যস্থ হলেন।

হলেন বটে, কিন্তু ব্যাপার তবু পরিষ্কার হল না। কিন্তু মেসের ব্যাপারে বটুক ঘোষের তিনটে চোখ। বটুক কিছু শুনে আর কিছু দেখে ব্যাপারটা একরূপ অনুমান করে নিলেন।

বললেন, ঠাকুর মশাই, অবধূতবাবুকে মাছ দেননি?

অনেক লোকের সমাগম দেখে ঠাকুর তখন অনেকখানি সাহস পেয়েছে। এমন কি, ফিক ব্যাথা সত্ত্বেও কোমরে হাত দিয়ে উঠে দাঁড়িয়েছে।

সদম্ভে বললে, দেল, কি নিজে খাইল!

অবধূত ঝাঁঝিয়ে উঠল। বললে, ফের মিথ্যে কথা! দিয়েছেন? একখানা মাছের জন্যে আমি মিথ্যে কথা বলছি বলতে চান? হুঁঃ!

রাগে অবধূতের সর্বশরীর কাঁপছিল। সবাই জানে, মিথ্যা কথা বলবার লোক সে নয়।

ঠাকুর এবার অবধূতকে আড়াল করে বটুক ঘোষের সম্মুখে এসে দাঁড়াল।

আস্তে আস্তে বললে, আম্মার মাছ গণতি অছি। আপনি দেখন্তু, দুই খণ্ড রহিছি। যদি ন দেইছি তবে গেলা কোয়াড়কু? আম্মি তো খাই নাহু!

বলে পেটে হাত দিয়ে দেখাল। অর্থাৎ খেলে পেটের মধ্যেই থাকত এবং দেখাও যেত নিশ্চয়।

তারপর বললে, আউ অতিরিক্ত মাছ আম্মি কোয়াড়ু পাইব?

বিড় বিড় করে অবধূত ঠাকুরের কথা পুনরাবৃত্তি করে বললে, কোয়াড়ু পাইব!

ঠাকুর তার দিকে ফিরে বললে, আউ!

তারপর বটুকের সামনে এঁটো হাত নাড়তে নাড়তে বললে, আম্মি কহুছু তেবে বিড়াড়ি খাইছি।

বাধা দিয়ে দাসু বললে, বেড়ালে খেয়ে গেলে উনি দেখতে পেতেন না?

ঠাকুর আরও সরে এসে ফিস্ ফিস্ করে বললে, টিকে ঘুম করি-ছিলে। খাইতে খাইতে প্রত্যহ অবধূত বাবু টিকে ঘুম করিছন্তি। সেহি অবসরে,

নাক সিট্‌কে অবধূত বললে, আরে না মশাই! ঘুম কিসের! মাঝে মাঝে চোখ বন্ধ করে ভাবি হয়তো।

ঠাকুর বললে আউ থরা পায়খানা যাই ছিলে!

— খেতে খেতেই?

ঠাকুর হাত নেড়ে বললে, হাঁ-আ-আ। প্রত্যহ একবার করি। পায়খানা, আউ টিকে ঘুম।

অবধূত জিভে একটা টাকান্ দিয়ে বললে, আরে সে কতক্ষণের জন্যে মশাই? গেলাম আর এলাম।

বটুক ঘোষ বললেন, খেতে বসেছেন তো এখন নয়! এক ঘণ্টার ওপর হল। ওই হয়েছে মশাই, বেড়ালেই নিয়ে গেছে আপনি যখন পায়খানায় গিয়েছিলেন।

মাথা নেড়ে অবধূত বললে, তা হবে কি করে মশাই? তা হলে আমার মনে থাকত না? দেখে যেতাম মাছ, এসে দেখতাম নেই। বুঝতেই পারতাম।

—তবে মশাই, যখন ঘুমিয়েছিলেন তখনই খেয়ে গেছে। ওর আর কথা নেই।

অবধূত সে কথাও বিশ্বাস করতে চাইল না। তীব্রকণ্ঠে প্রতিবাদ করে বললে, কী যে বলেন! তাই যায় কখনও? কোনো দিন খায় না, আজই খেলে?

দাশু বললে, এখন থেকে রোজই খাবে দেখবেন। এতদিন ধরতে পারেনি। এখন চিনে ফেলেছে আপনাকে।

কেষ্টা ভিড় ঠেলে এতক্ষণ পর্যন্ত ভেতরে আসবার সুবিধা পায় নি। এখন ভেতরে এসেই এমন এক কাণ্ড করে বসল যাতে সমস্ত ঘটনা জলের মতো পরিষ্কার হয়ে গেল।

অবধূতের থালার কাছে হাঁটু গেড়ে বসে তার পাতের নিচে নজর দিয়েই কেষ্টা চেঁচিয়ে উঠল, ওই তো মাছের কাঁটা। দেখসিয়েন, দেখসিয়েন!

সত্যিই বটে! অবধূতের পাতের নিচে সরু-সরু ক'টি কাঁটা রয়েছে। নিশ্চয় বেড়ালে খায়নি।

সবাই অবাক অবধূত নিজেও।

কয়েক মুহূর্ত পরে পিঁড়িতে পুনরায় বসে একটু অপ্রস্তুতভাবে অবধূত বললে, তাহলে বোধ হয় ঘুমের ঘোরে আমিই খেয়েছি। মনে নেই।

দাশু দাদার কাণ্ডকারখানায় মনে মনে বিরক্ত হচ্ছিল। বললে, আর বসতে হবে না। খুব খাওয়া হয়েছে। ঘণ্টা দুই হল। উঠুন এইবার।

অবধূত মুখ ভেঙ্‌চে বললে, না বসতে হবে না! আমি কি খেয়েছি না কি? সবে মাত্র বসেছি। খুব খাওয়া হয়েছে!

অবধূত ভাতে ডাল মাখতে লাগল। আর ঠাকুর দিগ্বিজয়ী বীরের মতো রান্নাঘর মাতিয়ে বেড়াতে লাগল।

সবাই ওপরে উঠে এল।

বটুক ঘোষের দিবানিদ্রার অভ্যাস নেই। সমস্ত দুপুর বেলা ঠায় বসে হয় খবরের কাগজ, নয় একখানা নভেল, নয়তো আর কিছু পড়েন। খবরের কাগজ কেনার পাঠ এখানে নেই। অবধূত একখানা করে মফঃস্বল সংস্করণের ইংরিজি খবরের কাগজ পায়, তাই রেল-অফিস থেকে নিয়ে আসে। সেখানাও কারও উলটে দেখার সময় নেই। এক বটুক ঘোষই পড়েন, এই সময়। বাকি সবাই নিদ্রা যায়।

আরও আধঘণ্টা পরে অবধূত এল। খাওয়ার পরে তার আবার অনেক তুকতাক আছে। সোজা ছাদে গিয়ে প্রথমে মট্‌মট্‌ করে আঙুল মট্‌কালে, সূর্যের পানে তাকিয়ে প্রণাম করলে, বার কয়েক তুড়ি দিলে, অবশেষে বাঁ নাক টিপে ডান নাক দিয়ে জোরে জোরে নিশ্বাস নিতে লাগল। মিনিট তিনেক। পেটে বার কয়েক হাত বুলোলে।

ওতে নাকি হজম ভালো হয়।

তারপরে ঘরে এল।

মুখশুদ্ধির জন্যে কাগজে মোড়া মসলা থাকে। খানিকটা মসলা

হাতে নিয়ে অবধূত জানালার ধারে আলোর কাছে গেল। সযত্নে ধূলা-বালি-ময়লা বেছে ফেলে দিলে।

আপন মনেই একবার বললে, মসলাটা কিছুতে মুড়ে রাখবে না। খোলা কাগজে পড়ে রয়েছে। যত ধুলো-বালি, আরশুলার নাদি। একদিন দেখেছি ছারপোকা ঘুরে বেড়াচ্ছে। হুঁঃ!

ঘরের ভিতর থেকে গোবর্ধন বললে, চোখ বুঁজে খেয়ে নাও। রাতকানা সেরে যাবে।

অবধূত হেসে ফেললে। বললে, তাহলে ঠাকুর মশাইকে খাওয়াও ছারপোকা মুঠো মুঠো করে। আমাদেরও ছারপোকা মরুক, ওরও রাতকানা ভালো হোক!

বটুক ঘোষ চমকে উঠলেন।

বললেন, উনি রাতকানা নাকি?

অবধূত হেসে বললে, রাতকানা দিনকানা সবই। নইলে অমন বাহারের রান্না হয়!

—যা বলেছেন!—বটুক ঘোষও হাসলেন।

আশ্চর্য! অবধূতের মনে কিন্তু ঠাকুরের সম্বন্ধে বিন্দুমাত্র রাগ নেই। সে বড় একটা রাগেই না। মেসের সবাই তার পিছনে লাগে। অধিকাংশ সময়ই রাগে না। তাদের ঠাট্টা বিদ্রূপ গায়েই মাখে না। যদি কখনও রাগে-ও, তখনই তা জল হয়ে যায়। কিছুই মনের মধ্যে পুষে রাখে না। ঠাকুরের সঙ্গে এত বড় যে একটা কলহ হয়ে গেল, যাতে এতখানি সে অপদস্থ হল, সে রাগও কখন নিভে গেছে। রাগও নেই, অপদস্থ হওয়ার লজ্জাও নেই। এখন যে সে হাসছে, পরিহাস করছে,—তাও বিন্দুমাত্র বিদ্বেষের সঙ্গে নয়, অত্যন্ত স্বাভাবিক এবং সরলভাবে।

হাসতে হাসতে ঘেরা বারান্দায় সে একখানা মাদুর পাতলে।

অবধূতের দু'খানা মাদুর আছে। একখানা আটপৌরে, একখানা

পোষাকী। প্রথমখানা যে-কোন লোকের বসবার জন্যে। তার নিচের পিঠটা কালো হয়ে গেছে, বহু দিনের ব্যবহারে, ধূলায়-মলায়।

দ্বিতীয়খানির অবস্থাও যে খুব রাজকীয় তা নয়। তবে প্রথম-খানির মতো অত জরাজীর্ণ হয়নি। এইখানি দুপুরে এবং রাত্রে তার নিজের শোবার জন্যে মসলন্দরূপে ব্যবহৃত হয়। এটিও অতি ব্যবহারে পাছে ময়লা হয়ে যায় বলে এর উপর কখনও একখানা পুরোণো কাপড়, অভাবে খবরের কাগজও পাতে।

আজ পাতলে একখানা পুরোনো কাপড়। জায়গায় জায়গায় ছিঁড়ে গেছে। এবং পাছে আরও ছিঁড়ে যায় সেই ভয়ে খুব আলতোভাবে এক পাশে শুল। তারপরে একখানা খবরের কাগজ নিয়ে তার বিজ্ঞাপনের পাতা গম্ভীরভাবে নাতিউচ্চ স্বরে টেনে টেনে পড়তে লাগল :

— নব নাট্যসমাজ - অগ্নিশিখা - - মহাসমারোহে তৃতীয় রজনী— বাসুকীর ভূমিকায় বিখ্যাত অভিনেতা কালোবরণ অধিকারী— অসামান্যা নৃত্যপটিয়সী শ্রীমতী ছায়ারাণীর অগ্নিনৃত্য দেখিয়া নয়ন সার্থক করুন—ইত্যাদি ইত্যাদি।

একবার অবধূত আপন মনেই বললে, ভালো হয়েছে।

এর মানে কিন্তু এ নয় যে, অবধূত নাটকটা দেখে এসেছে, এবং তার ভালো লেগেছে। ছাপার হরফে কোনো কিছু বেরুলেই ও ধরে নেয় যে সেটা ভালো।

মিনিট দুয়েক আপন মনে বিড় বিড় করে এমনি পড়তে লাগল এবং সঙ্গে সঙ্গে মন্তব্য করতে লাগল। তারপরই আর কোন সাড়া না পেয়ে দেখি, হাতের ওপর মাথা রেখে ও দিব্যি ঘুমুচ্ছে !

আসলে এই পড়াটা ওর ঘুমের ওষুধ। সেজন্যে সব সময়ে যে খবরের কাগজই চাই, এমন কোন কথা নেই। রাস্তায় যে সমস্ত বিজ্ঞাপন বিলি হয় তাই, এমন কি মুড়ি মুড়কির ঠোঙা হলেও তার চলে যায়।

পড়তে পড়তে তার ফুস আসে। ঘুম ঠিক নয়,—অবধূত বলে,—আবিল্যি।

বোধ হয় একটু নিদ্রাকর্ষণ হয়েছিল। হঠাৎ একটা অস্বাভাবিক চীৎকারে এবং বহু লোকের পদশব্দে লাফিয়ে উঠলাম। ঘুমের ঘোরে প্রথমে যেন শুনলাম, পোস্ত। তারপরে নিচে গিয়ে শুনি, পোস্ত নয়,—পোষ্টকার্ড।

কেষ্টা একটা ভাঙা বঁটি উঁচিয়ে বীরদর্পে দাঁড়িয়ে আছে, আর বৃদ্ধ ঠাকুর মশাইও দেওয়ালে পিঠ দিয়ে বজ্রকণ্ঠে অনর্গল বিশুদ্ধ উড়িয়া বলে যাচ্ছেন।

ব্যাপারটা কি?

নিচের ঘরে ঠাকুর আর চাকর শোয়। কেষ্ট আজ সকালে একখানা পোষ্টকার্ড তার মাদুরের নিচে রেখে দিয়েছিল। সেখানা পাওয়া যাচ্ছে না।

কেষ্ট বলে এর মধ্যে ঘরে আর কেউ ঢোকে নি। এ নিশ্চয় ঠাকুরের কাজ। ঠাকুর আজ একখানা চিঠিও লিখেছে।

ঠাকুর চিঠি লেখার কথা অস্বীকার করছে না। বলছে, সে-পোষ্ট-কার্ড সে কিনে এনেছে, কেষ্টার নয়। চিঠিখানা এখনও সে ফেলেনি। আমাদের দেখাল।

কেষ্টার যদি বা কিছু সন্দেহ ছিল, পোষ্টকার্ড দেখার পরে নিঃসংশয়ে বললে, ওইখানাই তার।

ঠাকুর চিঠিখানা তার নাকের গোড়ায় ধরে জিগ্যেস করলে, তুম্ভার এহিখণ্ড কি?

কেষ্টা পোষ্টকার্ডের দিকে ভালো করে চাওয়ার প্রয়োজন পর্যন্ত বোধ করলে না। দ্বিধাহীন স্বরে উত্তর করলে, হাঁ, আমার।

ঠাকুর পোষ্টকার্ডখানা বটুক ঘোষের হাতে দিয়ে বললে, দেখত্ত বাবু, এহিটা নৌতুন, কি পুরুণ ?

এ মামলার কি রায় দেওয়া যায় বটুক ঘোষের মাথায় এল না। সমস্যা খুবই জটিল। কয়েক ঘণ্টার আগে-পিছু কেনা দু'খানা পোষ্টকার্ড। তার মধ্যে একখানি অনুপস্থিত। অপরখানিকে দেখে নির্ণয় করতে হবে, সেটি নতুন, না পুরোণো। এবং রায় দিতে হবে সেটি ঠাকুরের, না কেষ্টার !

বটুক ঘোষের অঙ্ক-কষা মাথাও বিচার করতে গিয়ে ঘেমে উঠল। কিন্তু তখনই তাঁর মস্তিষ্কের মধ্যে একটা তরঙ্গ খেলে গেল।

নিচের ঘর অত্যন্ত অন্ধকার। বাইরে থেকে ঘরে ঢুকলে তো প্রথমে কিছুই দেখা যায় না। ক্রমে বোধ হয় বটুকের চোখ অনেকটা অভ্যস্ত হয়ে এসেছে।

কেষ্টার বিছানার দিকে অঙ্গুলিনির্দেশ করে বললেন, এখানে কেউ ঘুমিয়ে আছে, না কি ?

কেষ্টা বললে, ও আমার মামা।

—হলই বা মামা ? এত গোলমালে ঘুম ভাঙে না সে কেমন মামা ?—বটুক বাবু রেগে গেলেন।

জিজ্ঞেস করলেন, বাড়ী কোথায় ?

—মুর্শিদাবাদে।

—তাই হবে। এমন নবাবী ঘুম অন্য জেলার লোক পাবে কি করে ?

বটুক কিন্তু মুর্শিদাবাদী ঘুমের মর্যাদা রাখলেন না। হিন্দিতে হুকুম দিলেন, উঠাও উস্‌কো।

কেষ্টা প্রথমে বার কয়েক সকাতরে 'মামা, মামা' বলে ডাকলে। সাড়া পেলে না। শেষে ঠেলতে লাগল। অনেক ঠেলাঠেলির পর মামা উঠে বসে চোখ রগড়াতে লাগল।

হ্যাঁ মামা বটে! মাথায় কেষ্ট-ঠাকুরের মতো এক রাশ ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া চুল। কাঁচা ঘুম ভেঙে যাওয়ায় চোখ লাল। যাকে বলে করঞ্জাক্ষ।

ব্রেন-ওয়েভ বোধ হয় একেই বলে। বটুক ঘোষের কি খেয়াল হল কে জানে, রুক্ষ কণ্ঠে জিজ্ঞেস করলেন, পোস্টকার্ড কোথায়?

মামা চোখ মেললে না। কেবল বাঁ হাতটা মাদুরের ভেতর চালিয়ে দিলে।

বটুক আবার এক ধমক দিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, আরে পোস্ট কার্ড, পোস্ট কার্ড। কোথায়?

মামা বিরক্তভাবে উত্তর করলে, দিচ্ছি তো মশাই।

বাঁ হাত দিয়ে মাদুরের ভেতর থেকে মামা বের করলে একখান পোস্টকার্ড। তেলে মলিন হয়ে গেছে।

হাঁই তুলে বললে, চৌকির নিচে পড়েছিল। তুলে রেখেছি।

বটুকবাবু গম্ভীরভাবে হুকুম দিলেন, কেষ্ট, তুমি আজকে থাক, কাল সকালে মাইনে মিটিয়ে চলে যাবে।

কেষ্ট বললে, আমি কি করব? আমি কি জানি, মামা তুলে রেখেছে? আচ্ছা লোক বটে!

বলে মামার দিকে কোপকটাক্ষ নিক্ষেপ করলে। কিন্তু মামার তখনও চোখ রক্তবর্ণ। ঘুমের ঘোর কাটেনি। সে ভাগ্নের কটাক্ষ গ্রাহ্যই করলে না।

ঠাকুর এতক্ষণ পর্যন্ত চুপ করেই ছিল। হঠাৎ লাফিয়ে উঠে কেষ্টার জামার কলার চেপে ধরে চিৎকার করে উঠল, সড়া, মারিবি? আয় সড়া, মারিবি আয়!

কেষ্টা বেকুব বনে গিয়েছিল, বলবার কিছু ছিল না। তবু একবার সকলের সহানুভূতি আকর্ষণের জন্যে বললে, দেখুন বাবু, দেখুন!

অবধূত ঠাকুরকে সরিয়ে দিলে। কিন্তু বটুক ঘোষের কিছুমাত্র

সহানুভূতি জাগ্রত হল না।

বললেন, আর দেখাতে হবে না, আমি অনেক দেখিছি। তোমার আস্পর্দ্ধা যথেষ্ট বেড়েছে।

কাঁদ কাঁদ হয়ে কেষ্টা বললে, আমি কি করলাম বাবু?

—তুমি বঁটি নিয়ে ঠাকুরকে মারতে যাও? আমরা না এলে তো,

কেষ্টা হাতের বঁটি আগেই ফেলে দিয়েছিল। বটুকবাবুর কথায় বাধা দিয়ে বললে, মাইরি মারতে যাইনি। শুধোন সবাইকে বঁটি আমার হাতে ছেল।

—ছেল! স্পষ্ট দেখলাম,

—শুধোন ঠাকুর মশাইকে, আমি ওইখানে বসে তরকারী কুটছিলাম কি না?

কেষ্টার বাহাদুরী আছে! একেবারে ঠাকুর মশাইকেই কেষ্টা সাক্ষী মেনে বসল! আর এত তাড়াতাড়ি যে, ঠাকুর ভড়কে গিয়ে কি যে উত্তর দেবে ভেবেই পেল না।

কেষ্ট আবার জোর দিয়ে কাঁদ কাঁদ সুরে বললে, শুধোন না ঠাকুর মশাইকে! ছোট ছেলে পেয়ে আমার উপর দোষ দিতে সবাই পারে! হ্যাঁ।

কেষ্টা হাত দিয়ে চোখ মুছলে।

কেষ্টার চোখের জলে ঠাকুর বিগলিত হল। অনেক ভেবে-চিন্তে বললে, তা সম্ভব হতে পারে।

বটুকবাবু অপ্রস্তুত। তবু ধমক দিয়ে বললেন, যাঃ! যাঃ! আমি নিজের চোখে দেখলাম!

কেষ্টা তবু বলে, শুধোন না ঠাকুর মশাইকে!

—আমি অত শুধোনার ধার ধারি না। তোমার চাকরী খতম হল। কাল মাইনে মিটিয়ে নিয়ে চলে যাবে।

বটুকবাবু আর দাঁড়ালেন না। হন্ হন্ করে উপরের বারান্দায় চলে গেলেন।

কিন্তু অবধূত ধীর, স্থির ছেলে। সে অত সহজে রায় দিতে পারলে না। আর একবার নতুন করে সমস্ত ঘটনা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে জেনে নিলে। তখন কেষ্টা অনর্গল মিথ্যে কথা ব'লে আর কেঁদে এমন ভাবে ঘটনার মোড় ফিরিয়ে দিয়েছে যে, কার দোষ বোঝার উপায় নেই। তাঁর কান্নায় ঠাকুরও হতচকিত হয়ে গেছে। সে কখনও রুখে উঠছে, কখনও কেষ্টার কথাই সমর্থন করছে। অবধূত এক কথা একশোবার জিজ্ঞেস করে, দু'পক্ষের সকল কথা বার বার শুনে এক মিনিট গুম্ হয়ে রইল।

অবশেষে কেষ্টাকে বললে, যাক্‌গে। বঁটিটা এক্ষুনি ওপরে গিয়ে রেখে দিয়ে আয়।

কেষ্টা বললে, কি রেখে দিয়ে আয়। তরকারী কুটব কিসে?

অবধূত বললে, যখন কুটবি তখন নামিয়ে আনবি। আবার কোটা শেষ হলেই ওপরে দিয়ে আসবি।

দাস্থু বিস্মিতভাবে বললে, আপনার যত অনাসৃষ্টি। বঁটিটা কি দোষ করলে?

অবধূত জিভে একটা টাকান্ দিয়ে বললে, তুমি বোঝ না। ও কেষ্টাও থাকবে, ঠাকুরও থাকবে, ঝগড়াও থাকবে। বঁটিটা সরানোই ভালো।

অবধূত ফিক্ ফিক্ করে আপন মনেই হাসতে হাসতে উপরে চলে এল।

এ মেস থেকে কেউ যায় না। বহুদিন থেকে অবধূত দেখে আসছে, এ মেসে যে একবার আসে সে আর যায় না। এইখানেই থেকে যায়। কি বাবু, কি ঠাকুর-চাকর।

এখানে দুঃখের এবং অসুবিধার অন্ত নেই। একখানা মাত্র ঘর, তারও জানালা নেই, শুধু একটি দরজা। আলো বাতাসের প্রবেশপথ শূন্য। নিতান্ত অস্বাস্থ্যকর। খাওয়া-দাওয়া তো ওই। ঠাকুর কি যে

1

রাঁধে, বোঝবার উপায় নেই কোনটা কপির তরকারী আর কোনটা পেঁপের।

অথচ সবাই আছে। বাবুরা কেউ যাবার নামও করে না। ঠাকুর আছে তার অবশ্য উপায় নেই। ও রান্না আর তো কোনোখানে চলবে না। কিন্তু বাজারে কেষ্টার মতো চাকরের চাহিদা আছে। অনেকে ছ'টাকামাইনে বেশি দেবার লোভও দেখায়। সেও যায় না। তাড়িয়ে দেবার কথায় কেঁদে ভাসিয়ে দেয়।

অবধূত জানে। সুতরাং সতর্কতার জন্যে বঁটিটা সরিয়ে রাখার রায় দিলে!

## ॥ তিন ॥

কলে জল এল। সাড়ে তিনটে বাজে।

অবধূত, দাস্থ, গোবর্ধন আগেই বেরিয়ে গেছে। বটুক ঘোষও তাঁর খয়ের রঙের পাঞ্জাবীটা গায়ে চড়াচ্ছেন দেখছি। বোধ হয় আর একবার দিগ্বিজয়ে বের হবেন। কেষ্টা আর ঠাকুর এই একটু আগে কাটাকাটি করছিল। দেখি দিব্যি ছাদের উপর এক বিছানায় দু'জনে পরম শান্তিতে ঘুমোচ্ছে।

শীতকালের তিনটে।

রোদ পড়ে এলেও ছাদে যথেষ্টই রয়েছে। সেই রোদ্দুরে দুজনে দুখানা কম্বল আপাদমস্তক মুড়ি দিয়ে সুখসুপ্ত। একটু চা-পানের প্রয়োজন অনুভব করছিলাম। কিন্তু ওদের কাউকে জাগাতে আর ইচ্ছা করল না। অবধূত পোষাকী মাতুরটা তুলে নিয়ে গিয়েছিল, আটপৌরেটা পড়েই ছিল। লেপের মমতা কাটিয়ে আলোয়ানখানা গায়ে দিয়ে সেইখানে গিয়ে বসলাম।

বন্ধু, তোমাকে সত্যি কথা বলি, এই কলকাতা শহরের সঙ্গে এত-দিনেও আমার মনের মিতালি হয়নি। কলকাতাকে আমি চিনেছি মন দিয়ে নয়, বুদ্ধি দিয়ে। এর বড় বড় বাড়ী, বড় বড় কলকারখানা, ভালো রাস্তা, অসংখ্য ট্রাম-মোটর-জুড়ি আমার পৌরুষকে জাগ্রত করে, বুদ্ধিকে অঙ্কুশ মারে। মনকে স্নিগ্ধ করবার জন্যে এখানে না আছে নির্ম্মল নীল আকাশ, না আছে ঘনবিন্যস্ত সবুজ গাছের শ্রেণী। পাখী এখানেও মাঝে মাঝে ডাকে বটে, কিন্তু সে খাঁচার পাখী। আর ফুল পাওয়া যায় মিউনিসিপাল মার্কেটে।

এ কথা মনে পড়ে কেষ্টাকে দেখে।

কেষ্টা আমার চোখে পল্লী-ভুবনের স্বপ্ন বয়ে আনে। ভাবি, বাংলার কোন দূর নিভৃত পল্লীতে ওর নীড়। মহানগরী ওকেও টেনে এনেছে। কতই বা বয়স! এই বয়সেই ভাঙতে হয়েছে ময়ূরাক্ষীর বালুতটের বালির খেলাঘর, ছেড়ে আসতে হয়েছে বটের ছায়ায় কড়ি খেলা, আদুল গায়ে মাঠে মাঠে গোচারণ, বনে বনে বনফুল তোলা, আরও কত কি।

শহরের কারখানায় ওকে ঢালিয়ে পিটিয়ে নতুন করে তৈরী করা হচ্ছে। এখন ও পাথরে রস পেয়েছে। ময়ূরাক্ষীর তীর আর বোধ হয় ওর ভাল লাগবে না। ভালো লাগবে না বুড়ো বটের শ্যামচ্ছায়া, বিস্তৃত উদার মাঠ।

সেজন্যে কেষ্টাকে দেখে আমার তেমন দুঃখ হয় না। মহানগরীর আবহাওয়ায় এসে ও শুধু বদলে যায় নি, নিজেকে বেশ মানিয়েও নিয়েছে।

কষ্ট হয় জয়কালীকে দেখে। ওর নিজের দেশের আবেষ্টনীতে ওকে কখনও দোখনি। কিন্তু কল্পনা করতে পারি। উর্বর মাটির চারাগাছ, এখানে এসে ঝলসে গেছে। সতেজ শিকড় দিয়ে যে রস ও টানতে চায়, এখানকার পিচঢালা মাটিতে তা দুর্লভ। ওরই মুস্কিল হয়েছে। পাড়াগাঁয়ে মানুষকে হতে হয় সহজ, এখানে বিচক্ষণ হওয়া দরকার। সেই বিচক্ষণতা এই এক বছরের মধ্যে ও সংগ্রহ করতে পারেনি।

ওই তো জয়কালী! নাম করতেই হাজির। ছোকরা বাঁচবে অনেকদিন। হয়তো অনেকক্ষণ থেকেই গলির মোড়ে দাঁড়িয়ে আছে, আর ইসারা করে আমার দৃষ্টি আকর্ষণের চেষ্টা করছে।

—কি হে! ওখানে দাঁড়িয়ে কি করছ?

জয়কালী কথা বলে না। কেবল হাসে, আর আঙ্গুল দিয়ে

সাইরায় কি জিজ্ঞেস করে।

অবশেষে জানালার কাছে সরে গিয়ে বললাম, কি বলছ বুঝতে পারছি না।

জয়কালীও আরও একটু সরে এল। ফিস্ ফিস্ করে জিজ্ঞেস করলে, দাদা আছেন?

দাদা মানে বটুক ঘোষ।

বললাম, না। তিনি তো এই মাত্র বেরিয়ে গেলেন।

খবরটা পেয়েই জয়কালী পুলকিত হয়ে উঠল। তিন লাফে সিঁড়ি টপ্‌কে ভেতরে এসে উপস্থিত হল। ওর এক হাতে একটা কমলা-লেবু। খানিকটা খেয়েছে, আর বাকীটা খাওয়ার আয়োজন করছে।

হাঁপাতে হাঁপাতে মাদুরে বসে বাকী কমলা লেবুটা আমার দিকে এগিয়ে দিয়ে জিজ্ঞেস করলে, খাবেন?

মাথা নেড়ে জানালাম, ইচ্ছে নেই। জিজ্ঞেস করলাম, এত সকালে যে!

জয়কালী হাসতে লাগল। আমার কথার জবাব না দিয়ে জিজ্ঞেস করলে, দাদা কখন গেলেন, কখন?

বললাম, আধ ঘণ্টা হবে।

জয়কালী আবার একবার ফিক্ ফিক্ করে আপনমনেই হাসলে, চক্ চক্ ক'রে লেবুটা চুষলে।

তারপর বললে, আজ দাদা আমাকে ঠিক তাড়িয়ে দেবেন।

—কেন?

—এক কাণ্ড করে এসেছি।

জয়কালী সকালে এক কাণ্ড করে এসেছিল। আবার এরই মধ্যে নতুন কি কাণ্ড করলে ভেবে আমার ভয় হল।

সন্দিগ্ধকারে জিজ্ঞেস করলাম, মারধোর করে আসনি তো?

—না, মারধোর কেন করব? মারধোর নয়।

মোলায়েম কণ্ঠে জয়কালী আশ্বাস দিলে।

—তবে?

জয়কালী আবার একবার ফিক্ করে হাসলে। বললে, দিয়ে এলাম সব উলটে।

—সব উলটে দিয়ে এসেছ? কী উলটে দিয়ে এসেছ? কোথায়?

চক্ চক্ করে লেবু চুষতে চুষতে নিরুদ্বিগ্নচিত্তে জয়কালী বললে, প্রেসে।

জয়কালী এই দিকেই কি একটা প্রেসে কম্পোজিটারী করে। কাণ্ডটা সেই প্রেসেই ঘটেছে। মারধোর করে নি, কেবল সব উলটে দিয়ে এসেছে।

সভয়ে বললাম, কি উলটে দিয়ে এলে জয়কালী? বিশেষ গুরুতর কিছু বাধা দিয়ে বললে, বিশেষ কিছু নয় মশাই! কতকগুলো কেস্, তাই দিয়ে এসেছি প্রিণ্টারের ঘাড়ের ওপর উলটে।

জয়কালী পরম তাচ্ছিল্যের সঙ্গে এক কোয়া চোষা-লেবু বাইরের দিকে ছুঁড়ে ফেলে দিলে।

এ আর এমন কি ব্যাপার!

যার মাথায় কেসগুলো উলটে দিয়ে এসেছে তার মাথার অবস্থা না হয় নাই জিজ্ঞেস করলাম। হয় তো খানিকটা কেটে, কি হয়তো ফেটেই গেছে। হাসপাতালে নিয়ে গিয়ে শেলাই করিয়ে আনলেই রক্ত বন্ধ হয়ে যাবে। ওতে মানুষ কিছু মরে না।

আর টাইপগুলো বড় জোড় একাকার হয়ে গেছে। সেও এমন কিছু নয়। সেগুলোকে আবার ঘরে ঘরে সাজাতে একটা দিনই যথেষ্ট। একটা দিন প্রেসের কাজ বন্ধ থাকলে কিছু আর প্রেস উঠে যায় না।

সুতরাং এ পর্যন্ত চিন্তার কিছু নয়। আমার ভয় হল, এই শেষ?

না আরও কিছু আছে ?

জিজ্ঞেস করলাম তারপর ?

—তারপরে আর কি মশাই, সটান বেরিয়ে এসে দিলাম এক ছুট, একেবারে মেসের গোড়ায় এসে থামলাম

গলার শিরা ফুটিয়ে জয়কালী সগর্বে বললে, আমার সঙ্গে ছুটে ওরা পারে ? সোনাটিকুরীর বিলের নাম শুনেছেন ? সোনাটিকুরীর বিল ? একবার আখ ভাঙতে গিয়ে তাড়া করছিল। একছুটে সেই বিল পেরিয়ে বাড়ী এসেছিলাম। কি বলব, শরীর ভালো নয়, নইলে প্রেসের ও-ক'জনকে চিবিয়ে খেতে পারি।

বললাম, যাকগে। সে ভালোই করেছ। মানুষ চিবিয়ে সব হবে ! কিন্তু হয়েছিল কি ?

—হয় নাই কিছুই। তিন মাসের মাইনে বাকী। রোজই আজ দোব, কাল দোব করে। চাইতে যদি গ্যালাম, বললে তোমার পোষায় তো থাক, না পোষায় তো চলে যাও। মশাই, ওর লাল-চোখের আমি ধার ধারি ! বললাম, বেশ। কাল থেকে আর আসব না। মাইনে মিটিয়ে দিন। বললে কি জানেন ?

ঘাড় নেড়ে জানালাম, জানি না।

—বললে, সপ্তাহে আট আনা করে দোব, ইচ্ছে হয় নিও, নইলে নিও না।

জয়কালী কটমট করে আমার দিকে চাইলে। যেন আমিই তার মাইনে আটকেছি আমারই দোষ !

গর্জন করে বললে, দিলাম সব শুদ্ধ্যা উলটে। মর্‌গা কেঁদে মাঠে মাঠে।

বলে আবার নিশ্চিন্তে লেবু খাওয়ায় মন দিল। আমি নিঃশব্দে বসে রইলাম।

ভাবতে লাগলাম, প্রেসের লোকেরা জয়কালীর মেস চেনে

কিনা, ওরা পুলিস-টুলিস নিয়ে আসবে কি না। ভাবতে গিয়ে ভয়ে এবং দুশ্চিন্তায় সমস্ত দেহ কাঠের মতো শক্ত হয়ে উঠল। জয়কালী তো যাবেই, আমাদেরও থানা-পুলিশের হয়রানি কম পোয়াতে হবে বলে মনে হয় না।

একটি একটি ক'রে সমস্ত লেবুটা খাওয়া শেষ করে জয়কালী হঠাৎ ডান হাতটা আমার দিকে বাড়িয়ে দিয়ে ক্লান্তকণ্ঠে বলল, দেখুন তো হাতটা।

বললাম, আমি তো হাত দেখতে জানি না।

জয়কালীও ছাড়বে না। মাথায় একটা ঝাঁকি দিয়ে বললে, দেখুন না মশাই।

দেখতে হল। অনেকক্ষণ ধরে নাড়ী টিপে জিজ্ঞেস করলাম, তোমার কি হয় বল দেখি?

—রোজ একটু করে জ্বর হয়।

—সে কি! আজ সকালে যে বললে জ্বর হয় না!

—না, হয়। আজ হয়েছিল।

বললাম, হুঁ। আর কি হয়?

—আর চোখ জ্বালা করে।

গম্ভীরভাবে জিজ্ঞেস করলাম, কোন চোখ?

জয়কালী প্রথমে ডান চোখে হাত দিয়ে বললে, ডান চোখ। তারপরে বাঁ চোখে হাত দিয়ে বললে, বাঁ চোখ। অবশেষে দুই চোখই হাত দিয়ে পরীক্ষা করে বললে, না, না, দুই চোখই।

জিজ্ঞেস করলাম, আর?

—আর গায়ে-হাতে-পায়ে বেদনা তো আছেই। আপনাকে বলিনি?

বললাম, বলেছ! আর কিছু?

—আর কিছু না।

তারপর সকাতরে বললে, এখানে আর কিছু দিন থাকলে আমি

মরে যাব মশাই। দেখছেন না, এই ক'দিনে কি চেহারা হয়েছে? যা খাই তার কিছুই হজম হয় না। দিন রাত্তির কেবল পেট-ফুটফাট করে।

আমি কোনো উত্তর করলাম না।

জয়কালী বললে, বড়দিনে ওই ক'দিন ছুটি ছিল, প্রেসে যেতে হয় নাই, দেখেছিলেন কি রকম চেহারা হয়েছিল?

বড়দিনের চেহারার স্বরূপ ঠিক স্মরণ করতে পারলাম না। তবু বললাম, ভালো চেহারা হয়েছিল!

উৎসাহিত হয়ে জয়কালী বললে, ও আর কি ভালো মশাই! দেশে থাকতে ইয়া বুকের পাটা ছিল। আর তেমনি রং! গোলাপ ফুলের মতন। এখানে কিই বা খেতে পাই মশাই? সমস্ত দিন খেটে একটা কমলা লেবু! অমন বিশ গণ্ডা কমলা লেবু হলে তবে আমার পেটের একটা কোণ ভরে। হাসছেন?

বললাম, না। হাসিনি।

—সেখানে কি খেতাম জানেন? সকালে উঠেই সের দুই মুড়ি, আধ সের গুড় আর আধ সের দই। সাঁটিয়ে মেরে সকাল বেলা বেরুতাম। সমস্ত গাঁ চষে বারোটায় বাড়ী ফিরতাম। ফিরেই এক খাবোল তেল গায়ে মেখে জলে গিয়ে পড়তাম, সাঁতার দিয়ে দিয়ে যখন হাতের তেলো শাদা হয়ে যেত, চোখ লাল হত তখন উঠে আসতাম। আমাদের গাঁয়ের বাণেশ্বর দীঘির নাম শুনেছেন? সেই দীঘি বিশবার না পার হলে···হাসছেন?

আবার বললাম, না হাসি নি। তুমি বল।

—এসে কি খেতাম জানেন? যাক্‌গে। সে সব কি আর এখানে মেলে মশাই? দীঘিতে পদ্মফুলেরই বাহার·কি!

জয়কালী সশব্দে একটা বড় রকম দীর্ঘশ্বাস ফেললে।

জয়কালীর দুঃখ এরা কেউ বোঝে না। জয়কালী নিজেই কি বোঝে?

বললে, শরীরটা যদি ভালো থাকত মশাই, আমি কিছুই গ্রাহ্য করি না। যেদিকে দুই চোখ যেত চলে যেতাম। বেটা ছেলে, মাটি কুপিয়েও দু'বেলা দু'মুঠো ভাতের সংস্থান করতে পারতাম। কিন্তু ভগবান যে মেরে রেখেছেন!

আমি উত্তর দিলাম না।

আবার বললে, তাও যদি নিয়মিত মাইনেটা পেতাম, এত দুঃখ কি থাকত! ও-বেটাদের চাকরী ছেড়ে দিয়ে ভালোই করেছি, কি বলেন?

কিছুই বললাম না।

—দাদা এসে কি বলবে বলুন তো?

দাদাকে নিয়েই জয়কালীর যত দুর্ভাবনা। পুলিশও নয়, অন্য কিছুই নয়। এবং দাদা এসে যে কি বলবে সে আমি জানি। ইতিপূর্বে আরও একবার এ-রকম কাণ্ড হয়ে গেছে। দাদা বলবেন, চাকরী ছেড়ে দিয়ে খাবে কি শুনি? বলবেন, গরীবের ছেলের আবার তেজ কি?

নিজের মনেই জয়কালী সে কথা ভেবে নিয়ে বললে, বলুক গে দাদা যা খুসী। পরশু দিন ছেলে পড়ানোর মাইনে পাব। তাই নিয়ে পরদিন সকালে উধাও হব, আর ফিরব না।

আমি নিরুত্তর রইলাম।

নিজের মনে আবার কি-খানিক ভেবে জয়কালী ফিক্ ফিক্ করে হাসলে।

বললে, এখন আর দাদাকে চাকরী ছাড়ার কথা জানিয়ে কাজ নেই। কি বলেন?

বললাম, সেই ভালো।

—ইতিমধ্যে আর একটা দেখে নিতে পারব না?

— নিশ্চয় পারবে!

উৎফুল্ল হয়ে জয়কালী হাঁকলে, কেষ্টা! এই কেষ্টা!

—কেষ্টা তো নেই বাবু।—ঠাকুর সাড়া দিলে।

দেখি বেলা পড়ে এসেছে। শীতের বিকাল দেখতে দেখতে সন্ধ্যা হয়ে আসে। ঠাকুর উঠে একখানা ছেঁড়া কাপড় সেলাই করছে। পাশে তার পানের বটুয়াটা পড়ে আছে। কিন্তু কেষ্টা সেখানে নেই!

—কেষ্টা গেল কোথায়?

—এই যে বাবু।—নিচে কলতলা থেকে কেষ্টা সাড়া দিলে।

—ওখানে কি করছিস?

জানালা দিয়ে নিচে চেয়ে দেখি, কেষ্টার জামা, কাপড় কর্দমাক্ত। আর পা দিয়ে ঝর ঝর করে রক্ত পড়ছে। হাঁটুর কাপড় সেই রক্তে রাঙা হয়ে গিয়েছে। কেষ্টা কলতলায় সেই রক্ত ধুয়ে ক্ষতস্থান পরিষ্কার করছে।

আমার কথার উত্তরে কেষ্টা নির্লিপ্ত গম্ভীরকণ্ঠে বললে, কিছু করি নাই।

—কিছু করিসনি! তোর পা কাটল কি করে রে? কোথায় গিয়েছিলি?

কেষ্টা ওপর দিকে না চেয়েই তেমনি শান্তকণ্ঠে উত্তর করলে, কোথ্ যাই নাই।

—যাস নি? ওপরে উঠে আয় তো দেখি।

কেষ্টা ল্যাংচাতে ল্যাংচাতে ওপরে উঠে এল। দেখা গেল, হাঁটুর কাছে খামিকটা চামড়া উড়ে গেছে। ডান পায়ের বুড়ো আঙুলটাও জখম হয়েছে, ঝর ঝর করে রক্ত পড়ছে। আর দুই হাতের তালু রক্তে লাল হয়ে উঠেছে।

জয়কালীকে বললাম, আমার বাক্স থেকে আইডিনের শিশিটা বের কর তো। আর একখানা ফর্সা কাপড়। এ যে বেশ জখম হয়েছে!

জয়কালী সেগুলো আনতে গেল।

কেষ্টা মাথার পিছনটায় হাত দিয়ে বললে, এখানটাও ফুলে উঠেছে।

বললাম, ঠিক হয়েছে! তুমি যেমন বাঁদর, তার তেমনি শাস্তি হয়েছে! কার সঙ্গে মারামারি করতে গিয়েছিলি?

কেষ্টা দাঁত বের করে বললে, মারামারি লয়।

—তবে?

—টেরামে।

—বিনা পয়সায় ট্রামে উঠতে গিয়েছিলি?

এক গাল হেসে কেষ্টা বললে, হুঁ। যেমন টিকিট চাইতে এয়েছে আমি অমনি দেলাম এক লাফ। ব্যাকায়দায় এমন পড়লাম! আবার সেই সময়,—জানেন?—একটা সাইকেল পেছুন থেকে হুড়মুড় করে এসে পড়ল আমার এমন জায়গায়।

বলে কোমরটা দেখালে।

জয়কালী আইডিন নিয়ে ফিরে আসতে আসতে সাইকেলের কথাটা শুনতে পেলে

গর্জন করে বললে, দিলি না কেন বেটার গালে দুই চড়। তুই যে নিতান্ত ভাত-ঢোসা!

গালে চড় মারাটা জয়কালীর কাছে অতি তৃতীয় শ্রেণীর মার। ওটা কিছুই নয়। যে-কেউ যে-কাউকে যখন খুশি নির্বিবাদে মারতে পারে।

কিন্তু কেষ্টাও কারও কাছে ছোট হবার পাত্র নয়। মুখ বেঁকিয়ে বললে, আমার মানে অনেক বড় যে।

অর্থাৎ নইলে সেও দুই চড় দিতে কসুর করত না।

জয়কালী বললে, বড় হল তো কি হয়েছে? দু'ঘা দিতিস, দু'ঘা খেতিস।

মারামারির ক্ষেত্রে শিশুকাল থেকেই জয়কালী অত্যন্ত উৎসাহিত। ঢু'ঘা দিতেও উৎসাহ আছে, ঢু'ঘা খেলেও আপত্তি নেই। তার এখন শরীর ভালো নয়, বিকেলে একটু জ্বর হয়, চোখ জ্বালা করে, তথাপি

কিন্তু ঢু'ঘা খাওয়া সম্বন্ধে কেষ্টা ঘোরতর আপত্তি ছিল। একটা চুমকুড়ি কেটে বললে, উঁ। ভারী সুখ!

আমি ওদের কথা শুনছিলাম আর ব্যাণ্ডেজ বাঁধছিলাম। কিন্তু বাঁধব কার? হতভাগা এক জায়গায় পাঁচ মিনিট সুস্থির হয়ে বসতে পারে না। ব্যাণ্ডেজ বাঁধা না হতেই দশ বার বললে, ওই হয়েছে। ওতেই হবে। আর থাক। বাঁধা শেষ হওয়া মাত্র খোঁড়াতে খোঁড়াতে সরে পড়ল।

খানিক পরে নিচে নামতে গিয়ে দেখি শিল-নোড়া সামনে পড়ে রয়েছে। মসলা বাঁটতে আর বাঁটা হয় নি। কেষ্টা বাঁ হাতটা কানে দিয়ে, আর ডান হাত আকাশে তুলে কালোয়াৎজনোচিত নানাপ্রকার বিকট মুখভঙ্গি করে অত্যন্ত অস্পষ্ট স্বরে বড় রকমের কিছু একটা রাগিণী আপনমনেই বিনয়ে বিনিয়ে ভাঁজছে। আমি অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলাম। কিন্তু ও তখন এমনই আত্মহারা যে আমার উপস্থিতি টেরই পেল না।

সন্ধ্যে হতে দেরী আছে।

পাশের বাড়ী আবার সরগরম হয়ে উঠল। সকালের সেই বায়োস্কোপের প্রসঙ্গ। ভেবেছিলাম ও প্রসঙ্গের ওইখানেই যবনিকা পড়েছে। এখন বোঝা গেল, যবনিকা তো পড়েইনি, বরং উলটো।

সেই বেকার ছোকরাটি টিকিট পর্যন্ত কিনে এনেছে। টাকাটা শেষ পর্যন্ত কে দিয়েছে ভগবান জানেন।

আমি শুনলাম, ছোকরাটি এসেই চীৎকার আরম্ভ করেছে, ও ছুটু, তোরা এখনও তৈরী হয়ে নিস নি? তাহলে যাবিনে বল।

—বাবাঃ! বাবাঃ! তুমি একেবারে পায়ে ঘোড়া বেঁধে হাজির হও। এই তো তৈরী হচ্ছি। ও বৌদি! সেরে নাও বাপু।

বৌদিদির মৃদুগুঞ্জন শোনা গেল, ছোটঠাকুরপোর সব বিষয়ে তাড়াতাড়ি। সেইজন্যে কোথাও ওর সঙ্গে যেতে চাইনে।

ছোকরা আবার চীৎকার করে উঠল। বললে, গাড়ী ডেকে এনেছি যে! সে কি তোমাদের জন্যে দশঘণ্টা বাইরে বসে থাকবে সমস্ত দিন?

—থাকলই বা!

—ভাড়া নেবে না? কে দেবে কে? তুই দিবি?

—আমি কেন দোব? আমার কি দায় পড়েছে? তুমি যখন তখন আমার পেছুনে কেন লাগ বল তো? আমার বড় টাকা দেখেছ, না?

ছোকরা এবারে আকাশ ফাটিয়ে চীৎকার করে উঠল, আরে, গাড়ী দাঁড়িয়ে রয়েছে যে! গাড়ী, গাড়ী! তোমাদের জন্যে কি আমি মাথা খুঁড়ে মরব, না কি? ভালো মুস্কলে পড়েছি!

ছুটু সমানে পালটা চীৎকার করে বললে, আমরা তৈরী হচ্ছি তো!

বৌদিদিরা লোষ্ট্রাহত মৌমাছির মতো গুঞ্জন করে উঠল।

—আরে, গাড়ী যে দাঁড়িয়ে রয়েছে!

—জানি, জানি।

—জানিস তো তৈরী হয়ে নে! দেরী করছিস কেন?

—দেরী আবার কখন করলাম! তৈরী হচ্ছি তো! ও বৌদি, তৈরী হয়ে নাও না! আমার ব্লাউজটা এইখানে রাখলাম, গেল কোথায়, ও বৌদি?

—ওইখানেই আছে তো।

—কই এখানে? বাবাঃ! ছোড়দা আমার মাথা খারাপ করে দেবে। ই ব্লাউজটা?

—ছোড়দা মাথা খারাপ করলে। আরে গাড়ী দাঁড়িয়ে রয়েছে যে! এ কি তোর শ্বশুর বাড়ীর ঘরের গাড়ী? আলাদা ভাড়া নেবে যে! দিবি তুই?

—ও যাবে না।

নীচের থেকে খন্‌খনে বুড়ী হাঁফাতে হাঁফাতে এসে বললে, ও যাবে না। তোরা যা, ও যাবেও না, ভাড়াও দেবে না!

—তো, তাই বলুক!

—হাঁ তাই বলছে। ও যাবে না, তোরা যা। অবাক করলে মা! যত রোখ ওর ওপরে? যা, তোরা যা, ও যাবে না। তোরা যা। তোমার পায়ে সাত পেন্নাম বাবা, তোমার মতো ভাই যেন কারও না হয়!

—আরে গাড়ী দাঁড়িয়ে রয়েছে যে! সে ভাড়া নেবে না?

বুড়ী তখনও ওপরে ওঠার পরিশ্রমে হাঁফাচ্ছে। ছোকরার কথা সে কানেই তুলল না। আপন মনেই চেঁচাতে লাগল: এমন ভাই যেন কস্মিনকালে কারও না হয়। তুমি সহজ মানুষের হাড়ে পোকা পাড়তে পার বাবা। বোনের ওপর এমন যোশ্‌ ত্রিভুবনে কারও দেখিনি।

—আরে গাড়ী দাঁড়িয়ে রয়েছে যে!

—বিদেয় করে দে! বিদেয় করে দে!

আরও তিন বুড়ী কলহের গন্ধ পেয়ে নীচে থেকে ছুটতে ছুটতে এল। কলরব করে বললে, বিদেয় করে দে! এত লোকের নেন্‌জারেও কি তুই থাকতে পারিস?

বেধে গেল।

কোলাহলে দিঙ্মণ্ডল মুখর হয়ে উঠল। কোলাহলেরও বৈচিত্র্য আছে। লহরে-লহরে উঠতে উঠতে হঠাৎ এমনভাবে থেমে যায় যে, মানুষ চমকে ওঠে। সে চমক কাটতে না কাটতে আবার

চীৎকার ওঠে। ছেলেতে-মেয়েতে, বুড়োতে-বুড়ীতে, সে এক হট্টগোল। কেউ কারও কথা শোনে না, নিজে নিজেই চেঁচিয়ে যায়। মাঝে মাঝে হঠাৎ থামে। আশা হয় এইবার গোলমাল থামল। কিন্তু তখনই আবার দ্বিগুণবেগে জ্বলে ওঠে।

ভাবলাম, আজকের সিনেমায় যাওয়া তো চুলোয় গেলই, শেষে ফাটাফাটি না হয়। ঘটনাটা সেই রকমেরই।

জয়কালী বিরক্ত হয়ে বললে, মার, মার! ওদের না পারিস আমাদের এসে মেরে যা। আমরা আর পারছি না।

না পারারই মতন। কান ঝালাপালা হয়ে গেল। লোকে ভাববে, এ কলহ আর থামবে না, অনন্তকাল চলবে এবং মেস না বদলালে এরা সমস্তলোক কালা হয়ে যাবে। কিন্তু এরা এতে অভ্যস্ত হয়ে গেছে। এমন কি, কোনোদিন দৈবাৎ যদি গোলমাল না শোনে, নিজেদের মধ্যেই বলাবলি করে, কি হল! কারও অসুখ-বিসুখ হল নাকি! বেরি-বেরির যে রকম উৎপাত। দেখবেন মশাই!

মন খারাপ হয়ে যায়। যেন একটা অত্যন্ত অভ্যস্ত বস্তু, যা সব সময় হাতের কাছে থাকে, সেটা নেই। তাকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। কি রকম অস্বস্তি বোধ হয়।

তোমার মনে আছে কি না জানি না, আমার দোতলার শোবার ঘরের জানালার সামনেই একটা কৃষ্ণচূড়া গাছ ছিল। সেটা আমাকে আকাশ দেখতে দিত না। সে জন্যে অত্যন্ত রাগ ছিল গাছটার উপর। কিন্তু উপায় ছিল না সেটাকে সরিয়ে দেবার। কারণ সেটা ছিল আমাদের সীমানার মধ্যে নয়, পাশের বাড়ির সীমানার মধ্যে। সুতরাং গাছটার দিকে চাইলেই রাগে মনের মধ্যে গজ গজ করতাম। নিরুপায় আক্রোশে ফুলে উঠতাম।

তারপর অনেক বছর পরে সেবারের সেই বড় ঝড়ে গাছটা একরাত্রে উপড়ে পড়ে গেল। ভোর বেলায় জানালার দিকে চাইতেই

একবারে প্রভাত আকাশের মুখোমুখি!

প্রথমে, কিছু বোঝবার আগেই, মনটা আনন্দে ভরে উঠল। তারপরেই কি রকম গোলমাল লাগল: আকাশ দেখা যায়! কি হল ব্যাপারটা!

পরে খেয়াল হল, কৃষ্ণচূড়া গাছটা নেই। অনুমান করলাম, ঝড়েই পড়ে গেছে নিশ্চয়।

তুমি শুনলে অবাক হবে, গাছটার অনস্তিত্বে অভ্যস্ত হতে বেশ কিছু দিন সময় লেগেছিল। যেটার উপর অত রাগ, জানালার বাইরে চেয়ে সেইটেকে না দেখতে পেয়েই মনটা খারাপ হয়ে যেত। যে গাছটা দাঁড়িয়ে থাকতে আমার চোখে বিঁধত, পড়ে গিয়ে সেটা বিঁধত মনের মধ্যে, খচ্ খচ্ করে।

বস্তুতঃ পক্ষে কলহ-কোলাহলের মারফৎ ওই অদৃশ্য প্রতিবেশীর সঙ্গে এদের জীবনের যোগ ঘটেছে। কেমন করে তা কেউ জানে না। ও বাড়ী নিস্তব্ধ হলে এদেরও জীবনের এক জায়গায় যেন ফাঁক পড়ে যায়। এমন কি, শুনে সবাই আশ্চর্য হয়ে যাবে, ওদের কলহের বহর শুনে এরা অনুমান করতে পারে, কি রকম ওদের আহারের আয়োজন হয়েছে। ও-বাড়ীর প্রায় সকলকেই এরা মাঝে মাঝে দেখেছে। কিন্তু দেখলেও ঠিক চিনতে পারে না কোনটা কে? সত্যকার পরিচয় ঘটেছে কণ্ঠস্বর সূত্রে।

তুমি বলবে, সে আবার কী পরিচয়। যাদের মাঝে মাঝে চোখে দেখেছ কণ্ঠস্বরসূত্রে এমন দেখা যে, রাস্তায় দেখলে চিনতে পার না, তাদের সঙ্গেআবার পরিচয়টা কি? কণ্ঠস্বরসূত্রে পরিচয়ের মানে আছে?

আমি বলব, আছে। এবং সে পরিচয় দৃষ্টি সূত্রে পরিচয়ের মতো অর্থবান। কেন, গান শোননি:

এখনও তারে চোখে দেখিনি,
শুধু বাঁশী শুনেছি।

তেমনি আর কি!

তা সে যাই হোক, কলরব তখনই থামে, পর মুহূর্তে আবার দ্বিগুণ তেজে গর্জে ওঠে। আমরা অতিষ্ঠ হয়ে উঠলাম।

বললাম, চল বেরুনো যাক জয়কালী। এরা আর সিনেমায় যাবে না। সুতরাং সমস্তক্ষণ চেঁচাবে।

জয়কালী গালে হাত দিয়ে অন্যমনস্কভাবে কি যেন ভাবছিল। বললে, এখুনি যাবে, দেখুন তো!

—পাগল! সবাই কি রকম 'যাব না, যাব না' করছে শুনছ না? আর যাওয়া হল না। টাকা ক'টাই লোকসান।

জয়কালী উত্তর দিলে না।

বললাম, চল, ওদের টিকিট ক'খানা নিয়ে আমরাই বরং দেখে আসি। কি বল?

জয়কালী হাসলে।

বললে, দেখুন না কি হয়!

জয়কালীর কথা সত্যি। হঠাৎ এক সময়ে গোলমাল থেমে গেল। এক মিনিট···ছ'মিনিট···তিন মিনিট···

সভয়ে জিগ্যেস করলাম, কি হল হে?

জয়কালী উঠতে উঠতে বললে, সিনেমায় গেল, আবার কি হল।

নিচে থেকে হৈ হৈ করতে করতে গোবর্ধন এল: কেষ্টা! কেষ্টা!

জয়কালী উঠছিল, ফের বসল।

কেষ্টার অদ্ভুত একটা intuition আছে। ডাক শোনা মাত্র বুঝতে পারে কি জন্যে ডাকছে। বুঝলে, এবার গোবর্ধনের চা আনতে যেতে হবে। তার চা-পানের সময় হয়েছে সঙ্গে সঙ্গে গম্ভীরভাবে মশলা পিষতে বসল!

এবং আবৃত্ত কয়েক ডাকের পর মিহিকণ্ঠে ভালোমা ষর মতো বললে, কি বলছেন?

গোবর্ধন বললে, চা নিয়ে আয়।

—আমি মশলা পিষছি যে!

গোবর্ধন গর্জন ক'রে বললে, আগে চা নিয়ে আয়, তারপর মশলা পিষবি।

কেষ্টা ভারিক্কির স্বরে বললে, তাই হয় কখনো?

—তবে রে শূয়ার!

বলে গোবর্ধন গট্ গট্ করে নেমে যেতেই কেষ্টা ভালোমানুষের মতো হাত পেতে বললে, পয়সা দিন।

—মারতে না যাওয়া পর্য্যন্ত তুমি কথা শুনবে না, না?

কেষ্টা সে কথায় ভ্রূক্ষেপ না করে বললে, দিন পয়সা। ক' কাপ?

গোবর্ধন তার হাতে তিনটি পয়সা দিলে। বললে, তিন পয়সার। একটা বড় গেলাস নিয়ে যাস। নইলে কম দেবে।

চা এখানে কাপের মাপে আসে না, পয়সার হিসাবে আসে। চাও ঠিক নয়। কালো এক রকম তরল পদার্থ,--না দুধ না কিছু। কতকালের চা, সিদ্ধ হয়ে-হয়ে ওই রকম রং হচ্ছে। তবে তিন পয়সায় দেয় অনেকখানি।

কেষ্টা দুটো এলুমিনিয়ামের গ্লাসে গ্লাসে করে চা নিয়ে এল। আর তিনটে এনামেলের বাটি নিয়ে এল। প্লেট নেই। বাটিগুলো প্লেটের কাজ করবে।

জয়কালী তৃপ্তির সঙ্গে চায়ে চুমুক দিয়ে বললে, এই যে একটু আগে বললেন পয়সা নাই, এখন এল কোত্থেকে?

—মাইরি ছিল না। এখন পেলাম।

বলে গোবর্ধন পা দুলিয়ে হাসতে লাগল।

জয়কালী বিশ্বাস করলে না। বললে, হ্যাঁ পেলেন!

—মাইরি পেলাম। দুটো মোষ পড়েছিল জলে। কুলিদের বললাম, পাকড়ো। ছুটতে ছুটতে গাড়োয়ান এসে চার আনা পয়সা

দিয়ে মোষ ছুটো ছাড়িয়ে নিলে। ছ'আনা কুলিদের দিলাম, আর ছ' আনা…

বলে গোবর্ধন হাতের পাঁচটা পয়সা দেখালে।

—ছুটো মোষে চার আনা ?

গোবর্ধন নাক সিটকে বল্‌লে, আবার কত ?

জয়কালী জিগ্যেস করলে, আপনি পয়সা তো মন্দ পান না। কি করেন ?

গোবর্ধন হা হা করে হেসে বললে, খরচ হয়ে যায়। এই চায়েই আমাকে খেলে জয়কালী। চায়ে আর ট্রামে রোজ চারটি গণ্ডা পয়সা যায়।

জয়কালী বিজ্ঞের মতো বললে, ওই তো আপনার দোষ কি না ! একটি পা হাঁটতে চাইবেন না।

গোবর্ধন ঠোঁট কুঁচকে বললে, হাঁটতে পারি না।

গৌরব করে নয়, একটু লজ্জিত ভাবেই কথাটা বললে। কর্পোরেশনে একটা সামান্য চাকরী সে করে। সামান্য কিছু মাইনে এবং সামান্যতর উপরি, এই দিয়ে সে কোনো রকমে চালায়। কিন্তু হাঁটতে পারে না।

নিজের কথা বড় একটা সে বলে না। কিন্তু একদিন সন্ধ্যার পরে ছাদে বসে থাকতে থাকতে একটা অসতর্ক মুহূর্তে বলে ফেলেছিল। ওর বাবা বিহারের একটা ছোট শহরে কণ্ট্রাক্টরী করতেন। পয়সাও বেশ কিছু করেছিলেন। তাঁর ছিল ঘোড়ার শখ। ব্যবসায়ের জন্যে ঘোড়ার প্রয়োজনও ছিল অবশ্য।

পাঠ্যপুস্তকের চেয়ে ঘোড়ার উপরই গোবর্ধনের আকর্ষন ছিল বেশি। ছেলে-বয়সেই শহরের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ঘোড়সোয়ার হিসাবে সে নাম করেছিল। সেই প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড ঘোড়াগুলোই তাকে খোঁড়া করে দিয়ে গেছে। পায়ের দিক দিয়েও, লেখাপড়ার দিক দিয়েও।

হাঁটার অভ্যাস তার এখনও হল না। সে সব পারে, শুধু হাঁটতে পারে না।

নরহরি হেলে দুলে আসছিল। গোবর্ধনের কথাটা তার কানে গেল।

আভিজাত্যের দিক দিয়ে সে যে কারও চেয়ে ছোট নয়, এটা প্রমাণ করবার জন্যে নরহরি সব সময়ই তৎপর।

জুতোর ফিতে খুলতে খুলতে বললে, যা বলেছ! আমার যে ট্রামে কত পয়সা যায় তার ঠিক-ঠিকানা নেই।

নরহরির সঙ্গে জয়কালীর একদণ্ড বনে না। দু'জনেই সমান তেজী। একজনের ঔদ্ধত্য আর একজন সহ্য করতে পারে না। জয়কালী নরহরির কথায় মুখ হাঁড়ির মতো করে বসে রইল।

গোবর্ধন নরহরিকে তোয়াজ করে বললে, তোমার আর কি, বল? মোটা টাকা মাইনে পাও!

নরহরি সে কথা নীরবে স্বীকার করে নিলে। মাথা নেড়ে বললে, টাকা পয়সা কি সঙ্গে যাবে হে! ডান হাতে রোজগার কর, আর বাঁ হাতে উড়িয়ে দাও, ব্যস।

জয়কালী অসহিষ্ণুভাবে বললে, হুঁ!

নরহরির ক্রোধাগ্নিতে ঘৃতাহুতি পড়ল।

ফিরে দাঁড়িয়ে বললে, তার মানে? আমাকে কি তোমাদের মতো বাবু পেয়েছ না কি, যে পেটে কিল মেরে পড়ে থাকব? রোজ দু' পয়সা তো পাণেরই খরচ, তা জান?

জয়কালী হাত নেড়ে বললে, ও সব গল্প অন্য, লোকের কাছে কোরো। আমাকে বেশি ঘাঁটিও না।

নরহরিও হটবার পাত্র নয়। চোখ পাকিয়ে বললে, ঘাঁটিও না মানে? এই দেখ, নরহরিবাবু টাকাকে হাতের-ময়লা জ্ঞান করে। বুঝলে? তোমার মতো কেবল রুমালে গিঁট মারে না।

বসে জয়কালীর সুবিধা হয় না। সে কি কথা বলবার জন্যে উঠে দাঁড়াচ্ছিল। গোবর্ধন তার পিঠে হাত বুলিয়ে বসালে।

বললে, সময় এখন তোমারই ভালো চলছে জয়কালী।

জয়কালী এই কথাটা সইতে পারে না। তার বদ্ধমূল ধারণা, তার উপার্জনের উপর লোকের চোখ পড়লে কমে যাবে।

চোখ পাকিয়ে বললে, কি রকম?

গোবর্ধন হাসতে হাসতে বললে, তা বটে বই কি! ছেলে পড়িয়ে পাঁচটা টাকাও তো পাও। প্রেসে গোটা পনেরোর কম নয়। এ কি কম হল?

জয়কালীর আর না বলার উপায় রইল না। মুখ নামিয়ে গজ্-গজ্ করতে লাগল।

নরহরি বললে, তোমাকে ছেলে পড়াতে কে রেখেছে হে? কই 'দণ্ড' মানে বল দেখি?

—তুমি বল দেখি?

—'দণ্ড' মানে প্রহর। একটা বলে দিলাম। আর কি হয় বল?

জয়কালী দেওয়ালে ঠেস দিয়ে এলিয়ে পড়ল। ক্লান্তভাবে বললে, অভিধান দেখলেই হয়।

গোবর্ধন অনেকক্ষণ ভেবে বললে, 'দণ্ড' মানে প্রহর তো ঠিক নয়, প্রহরের অংশ।

নরহরি তাচ্ছিল্যের সঙ্গে বললে, ওই হল!

জয়কালী এতক্ষণে জোর পেলে। দেওয়ালের ঠেস ছেড়ে সোজা হয়ে উঠে বসে বললে, তবে? তুমিও জান না।

বুড়ো আঙুল উঁচিয়ে নরহরি বললে, তুমি তো আর ধরতে পারনি! পণ্ডিত!

জয়কালী বললে, তুমি বললে কেন?

—বেশ করেছি।

*জয়কালী একটু থেমে হঠাৎ বললে, তুমি বল দেখি—*

অনাদি কারণ তুমি জ্ঞানের অতীত,

রেখেছ আমার বোধ করে আচ্ছাদিত।

মানে কি?

উত্তর না দিয়ে নরহরি শুধু বললে, হুঁ।

জয়কালীর আর বসবার উপায় ছিল না। বটুক ঘোষ বেরিয়েছেন বটে, কিন্তু যে কোনো মুহূর্তে ফিরে আসতে পারেন। ফিরে এসে জয়কালীকে এমনি নিশ্চেষ্টভাবে বসে থাকতে দেখলে আর রক্ষা রাখবেন না। তার কাজ কিছুই নেই, তবু জয়কালীকে বেরুতে হবে। এর আগে আর একবার যখন তার চাকরী গিয়েছিল তখনও এই রকম হয়েছিল।

তখন গ্রীষ্মকাল। চনচনে রোদে মাথা পুড়ে যায়। বটুক ঘোষ হুকুম জারি করলেন, দশটার পরে যেন তোমাকে মেসে দেখতে না পাই।

মেসের কয়েকজন বটুক ঘোষের কাছে জয়কালীর পক্ষ থেকে অনুযোগ জানালে, এই রোদে ও যাবে কোথায়? রাস্তায় রাস্তায় ঘুরলে কি চাকরী পাওয়া যাবে?

তাদের হাঁকিয়ে দিয়ে বটুক ঘোষ বললেন, সে কি আর আমিও জানি না মশাই? জানি। কিন্তু ওকে তো চেনেন না, ও বসে থাকতে পেলে আর কিছু চায় না। কত ফন্দি করে কত চাকরী ছেড়েছে জানেন?

চাকরী করতে জয়কালীর ভালো লাগে না কলকাতায় থাকতেই ভালো লাগে না। এ কথা সবাই জানে। কিন্তু সে ক্ষেত্রে বটুক ঘোষ জয়কালীকে জব্দ করতে পারেন নি। সেই সময় দুপুরে তিনি কোথায় একটা কাজ পেয়েছিলেন। জয়কালী ঠিক দশটার সময় খেয়ে-দেয়ে কাপড়-জামা প'রে সমারোহ করে বেরিয়ে যেত। কিছুক্ষণ

কলেজ স্কোয়ারে বসে থেকে যেই বুঝত দাদা এইবার বেরিয়ে গেছেন, সেই ফিরে আসত। বেলা চারটে পর্য্যন্ত দিব্যি নিদ্রা দিয়ে বটুক ঘোষ বেরবার আগেই সরে পড়ত। সন্ধ্যার পর মুখ কালো করে ক্লান্তদেহে ফিরত।

মেসের আর সবাই ঠাট্টা করে বলত, কি হে কলেজ স্কোয়ারের আফিসে চললে না কি?

জয়কালী চট্‌ত, কিন্তু এ নিয়ে হৈ চৈ করতে সাহস করত না। পাছে ব্যাপারটা দাদার কানে যায়। সেই থেকে আজও তার ভয় যায়নি। এখনও দাদা ফেরবার আগেই বেরিয়ে পড়ে।

জয়কালী উঠে সিঁড়ি দিয়ে কেবল নামছে, এমন সময় নরহরি বললে কি হে জয়কালী, চললে না কি?

জয়কালী থমকে দাঁড়াল।

চোখ পাকিয়ে বললে, পিছু ডাকলে তো? যেই কোথাও বেরুব অমনি কেউ না কেউ পিছু ডাকবেই।

বেচারা সেইখানেই সিঁড়ির উপরই বসল।

মেসের সবাই প্রায়ই এই নিয়ে আমোদ করে। নরহরিও দুষ্টুমি করেই পিছু ডেকেছিল।

নিরীহভাবে বললে, না, বেরুচ্ছ কি না তাই জিজ্ঞেস করছিলাম।

—হাঁ বেরুচ্ছি। কিছু দরকার আছে তোমার?

—না, এমনিই জিজ্ঞেস করছিলাম! যাও, যাও।

জয়কালী কটমট করে তার দিকে একবার চেয়ে বেরিয়ে গেল।

বেচারা জয়কালী শহরে এসে কি মুস্কিলেই না পড়েছে! সবাই লেগেছে তার পিছনে!

দাদা বটুক ঘোষ তো রোদে বৃষ্টিতে ভোর থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত তাকে ঘোড়দৌড় করাচ্ছেন! বহু কৌশলে সে ধাক্কা যদি বা কাটাচ্ছে তো কেউ বা স্বাস্থ্য কেউ বা তার উপার্জনের উপর চোখ দিচ্ছে।

নয়তো বাইরে বেরুবার সময় পিছু ডাকছে !

জয়কালী আর পারে না? গ্রামের ছেলে এরা প্রায় সবাই। কিন্তু তার মতো করে গ্রামের মাটি, পুকুর বাগান ধানের জমিকে কেউ ভালোবাসেনি। কলকাতায় তার চলেছে, কারাগারের-বন্দী জীবন,—অসহ্য, তিক্ত।

বটুক ঘোষ যদি তাকে বলেন, যাও তুমি মুক্ত, তার গ্রাম পর্যন্ত দেড়শো মাইল পথ সে হেঁটেই সেরে দিতে পারে! এমন তার মানসিক অবস্থা !

## ॥ চার ॥

সন্ধ্যা হয়ে গেছে।

একটু বাইরে গিয়েছিলাম। কলেজ স্কোয়ারে বার কয়েক চক্র দিয়ে ফিরে এলাম। বেশ শীত পড়েছে আজ। কলেজ স্কোয়ারে তো কাঁপিয়ে দিচ্ছিল। অনেক দিন এরকম শীত পড়েনি। সেখানে দেখি বটুক ঘোষ উর্ধমুখে একটা নাক টিপে এমন জোরে বিশুদ্ধ-হাওয়া নিচ্ছেন যে, ভিড় জমে যাবার উপক্রম। আমি আর ওদিক দিয়ে, গেলাম না। বটুক ঘোষের দৃষ্টি এড়িয়ে ঘাসের উপর একটা অন্ধকার কোণে গিয়ে বসলাম।

শেষ অপরাহ্ণের কলেজ স্কোয়ার পরীক্ষার্থী ছাত্রদের আর ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা মেসের অন্ধকার ঘরে সমস্ত দিন পরীক্ষার পড়া তৈরী করে বেরিয়ে পড়ে। স্বাস্থ্যের জন্যে বিশুদ্ধ হাওয়া দরকার। একটু ব্যায়ামও দরকার। পরীক্ষা পাসের জন্য মাথায় ঠাণ্ডা হাওয়া লাগানো দরকার। তাই মেসের কোটর থেকে এই সময়টা তারা ঝাঁকে ঝাঁকে বেরিয়ে পড়ে। পোঁ পোঁ করে পার্কের চারদিকে কয়েক বার চক্র দেয়। তারপর একটুক্ষণ বেঞ্চের উপর বসে আবার মেসে ফিরে যায়।

এখন তারা চলে গেছে। বেঞ্চ দখল করেছেন এখন অবসর প্রাপ্ত বৃদ্ধের দল। তাঁদের দল বাঁধা আছে, বেঞ্চও বাঁধা আছে। নিজের নিজের দলের নির্দিষ্ট বেঞ্চের উপর তাঁরা আসর জমিয়েছেন। রোমন্থন করছেন অতীত জীবনের কথা এবং একালের ধ্বংপতনে শিউরে উঠছেন।

একটু রাত হতেই আরম্ভ হল গৃহস্থ বধূদের আগমন। বেশি নয়, অল্প কয়েকজন। যাদের স্বাস্থ্য একেবারে ভেঙে গেছে তারাই।

বাড়ির পুরুষদের সঙ্গে তারা ঘুরতে লাগল। মধ্যবিত্ত গৃহস্থ বধূ।

এদের দেখলে স্পষ্ট বোঝা যায় কোথায় নেমে আসছে মধবিত্ত সম্প্রদায়। গহনার বালাই নেই বললেই চলে। হাতে সরু সরু দু'গাছি করে ব্রোঞ্জে বাঁধানো চুড়ি। গলায় পিট পিট করছে সরু হার। পরণে বহুকালের কেনা জমকালো একখানা শাড়ি, যা রাত্রের অন্ধকারেই পরা চলে।

ঘোরার চেয়ে বিশ্রাম নেবার আগ্রহই তাদের বেশি। সঙ্গের পুরুষটির জন্যে নিতে পারছে না। এর উপর বাড়ি ফেরারও তাড়া আছে। রান্না হয়তো সেরে এসেছে। কিন্তু ঘরে রোগা-পটকা ছেলে আছে। ঘুমিয়ে পড়ার আগেই তাদের খাইয়ে দেওয়া দরকার।

আর এসেছে সেই রকম কয়েকটি তরুণী যাদের রূপ গেছে, স্বাস্থ্য গেছে, কিন্তু চোখ থেকে রোমান্স এখনও একেবারে যায়নি। অনেক লোকের মধ্যে সমস্ত দিন কাটিয়ে তারা স্বামী-স্ত্রী এইখানে, একটা অন্ধকার নিরিবিলি জায়গা দেখে নিশ্চিন্তে কিছুক্ষণ বসতে চায়। পরস্পর কথা হয়তো বলে, হয়তো বলেই না। তবু নিরিবিলিতে বসে যেন পুরোনো সত্তাকে একটুখানি অনুভব করতে পারে।

তাদেরও ফেরার তাড়া আছে। একটুখানি বসেই উঠে যায়।

আমার তাড়া নেই। তবু বেশিক্ষণ বসতে যেন ভালো লাগে না। আমার সমাজের জরাজীর্ণ প্রতিনিধিরা মনটাকে কেমন বিষিয়ে দিয়ে যায়।

বটুক বাবু ঘুরছিলেন। কিন্তু তাঁকে আর দেখা যাচ্ছে না। সন্ধ্যার দিকে ট্যুইশান আছে। বোধ হয় সেইখানে চলে গেছেন।

আমিও উঠলাম। ধীরে ধীরে মেসের দিকে পা বাড়ালাম !)

মেসে ঢোকবার সরু গলিটা দিনেই অন্ধকার থাকে। রাত্রে তো পা টিপে টিপে হাঁটতে হয়। সম্মুখেই কলতলা ; সর্বদা পিছল হয়ে আছে। একটু অসাবধান হলেই অধঃপতনের আশঙ্কা। সেইখান

থেকেই শুনতে পেলাম, নিচের ঘরে গান-বাজনা হচ্ছে।

গান-বাজনা, অর্থাৎ আমি জানি বলে। বাইরের লোকে হঠাৎ এসে ভয় পেয়ে যাবে। অন্ধকার ঘর। মিহি গলায় গান। এবং তদুপযোগী বাজনা। আচমকা মনে হনে হয়, ভূতের কীর্ত্তন হচ্ছে!

—কে? দাসু আর জয়কালী বুঝি?

কিন্তু ওরা তখন তন্ময়। আমার কথা হয়তো শুনতেই পেলে না।

আর ফিরেছে নরহরি। কতকগুলো সিকি, দুয়ানি, আনি একটা নিভৃত কোণে বসে ঠুন্ ঠুন করে গুনছে। জামা কাপড়ও ছাড়ে নি তখন পর্যন্ত।

—কি হে, কখন ফিরলে?

আমার দিকে না ফিরেই নরহরি উত্তর দিলে, এই এক মিনিট। আসুন। কত দূর গিয়েছিলেন?

—কাছেই। আরে ঠাকুরে চাকরে আজ তুমুল কাণ্ড, একেবারে বঁটি নিয়ে।

নরহরি সমস্তটা শোনারও প্রয়োজন বোধ করলে না। ওর সবই Summary trial ( সরাসরি বিচার )।

হুকুম দিলে, দূর ক'রে দিন দুটোকেই। আমার এখানে ও সব আদিখ্যেতা চলবে না। এ মেসের কাউকে আমি গ্রাহ্য করি না। আপনি নতুন লোক, জানেন না। রক্ষাকর জানে। কি বলহে রক্ষাকর।

ঠিক সেই মুহূর্ত্তেই রক্ষাকর এল।

কিন্তু রক্ষাকরের কিছুমাত্র বলার আগ্রহ দেখা গেল না। বেচারার মুখ শুকনো। জামাটা আলনার দিকে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে রক্ষাকর সটান শুয়ে পড়ল।

—তোমার আবার কি হল? —নরহরি জিগ্যেস করলে।

—বাড়ী যাওয়া হল না।

রক্ষাকর সশব্দে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললে।

—সে কি!

রক্ষাকর ঘাড় নেড়ে বললে, হুঁ, মাইনে পেলাম না।

দুঃখ করবার মতোই কথা। বেচারা বহু সাধ্যসাধনায় সাত দিনের ছুটি পেয়েছে আজ এক বৎসর পরে। কিন্তু মাইনে পেলে না। এদিকে ওর কে এক বন্ধু রেলে কাজ করে, তার মারফৎ শিলেট থেকে কমলালেবু আনিয়েছে এক বাস্কেট। আনতে দিয়েছিল দেড়শোটা এসে পৌঁছেচে বাহান্নটা। তাতেও দুঃখ ছিল না, যদি ছুটি পেত।

বললে, তিনটে টাকার অভাব পড়ছে।

নরহরি বিরক্ত হয়ে বললে, তোমারও দোষ আছে। ট্রেণ ভাড়াটা রেখেই জিনিষ কিনতে হয়! শিলেট থেকে ও-ছাই লেবু আনবার কি দরকার ছিল? কলকাতায় কি লেবু পাওয়া যায় না? সবাই শিলেট থেকেই আনাচ্ছে?

কী যে দরকার ছিল রক্ষাকর ও তা জানে না। কেবল জানে, এক বৎসর পরে বহু সাধ্যসাধনায় সাত দিনের ছুটি মিলেছে। ছুটি যে দেয়, সে কি আর পাওনা মাইনেটা মিটিয়ে না দেবে? বাড়ী যাওয়ার আনন্দে ওর মন ভ'রে উঠেছিল। ইতিমধ্যে হয়তো সেই রেলের বন্ধুটির সঙ্গে দেখা হ'য়েছিল। উৎসাহের আধিক্যে তাকে আনতে দিয়েছিল কমলালেবু। এক বৎসর পরে সে বাড়ী যাচ্ছে সেই আনন্দে বোধ হয় কিছু করতে চেয়েছিল। আমি নিজে দেখেছি, রক্ষাকর ওই বাস্কেট নিজে মাথায় করে শেয়ালদা ষ্টেশন থেকে ব'য়ে এনেছিল এখন ওটার দিকে চাইতেও রাগে ওর গা গড় গড় করছে। লেবু যদি না আনতে দিত কি বুদ্ধিমানের কাজই হত! কি নির্বুদ্ধিতাই যে মাথায় চেপেছিল!

নরহরি গম্ভীরভাবে বললে, আচ্ছা, তিনটে টাকা।

রক্ষাকর লাফিয়ে উঠল। চীৎকার করে বললে, মাইরি!

ঠোঁট উলটে নরহরি বললে, নিও তিনটে টাকা। ভারী তো টাকা।

রক্ষাকর যেন আকাশের চাঁদ হাতে পেল।

বললে, তাহ'লে আর আট আনা দিও ভাই। ছোট ভাইটির, জন্যে একখানা শেলেট নিয়ে যাব।

নরহরি তেমনি ভারিক্কি চালে বললে, নিও। দু-পাঁচটা টাকার জন্যে কাজ আটকাবে না, বুঝলে? অন্তত নরহরিবাবু যতক্ষণ আছে।

রক্ষাকর আর উৎসাহ ধরে রাখতে পারছিল না।

বললে, তাহলে কাল সকালের গাড়ীতেই চলে যাই। কি বল?

—বেশ তো।

রক্ষাকর চটপট জামাটা গায়ে দিয়ে নিলে। বললে, কই দাও তো টাকা।

—এখুনি?

—শেলেট কিনতে হবে যে!

নরহরি সাড়ে তিন টাকা বের করে দিলে। বললে, বাজিয়ে নাও।

কিন্তু রক্ষাকরের তখন বাজাবার ফুরসুৎ নেই। টাকা ক'টা পকেটে পুরে বললে, ঠিক আছে।

সঙ্গে সঙ্গে নিরীহ রক্ষাকর লড়ায়ের ঘোড়ার মতো সবেগে বেরিয়ে গেল।

নরহরি হেসে বললে, ট্রাম চাপা না পড়ে তো ভালো।

আধ ঘণ্টাও হয় নি। নিচে মুটুবাবুর গলা শোনা গেল, সরে যাও, সরে যাও—সিঁড়িতে কে আছ সরে যাও।

সচকিত হ'য়ে সিঁড়ির মাথায় যেতেই দেখি, মুটুবাবুর কাঁধে ভর দিয়ে ঘোষাল মশাই প্রায় অর্ধমৃত অবস্থায় ওপরে ওঠে আসছেন।

আমাদের দেখে মুটুবাবু চেঁচিয়ে বললেন, বিছানাটাই পেতে দাও, ঘোষাল মশাই খুন হয়েছেন!

খুন! নরহরির হাত-পা ভয়ে ঠক্ ঠক্ করে কাঁপতে লাগল।

তাড়াতাড়ি মুটুবাবুর বিছানটা যেমন-তেমন-করে পেতে দিলে। ঘোষাল মশাই এসেই নিঃশব্দে ধুপ্‌ করে শুয়ে পড়লেন। মুটুবাবু আকণ্ঠ লেপটা চাপিয়ে ছিলেন।

নরহরি সভয়ে জিগ্যেস করলে, রক্ত-টক্ত।

মুটুবাবু গম্ভীরভাবে বললেন, রক্ত আবার কি! জখম হয়েছেন।

মুটুবাবু ব্যস্তভাবে পোষাক ছাড়তে লাগলেন।

একমিনিট চুপ করে থেকে নরহরি বললে, Always time আপনাদের আমি বলি, ট্রামে চড়বেন না। তা ছেলেমানুষ বলে আমার কথা আপনারা গেরাহ্যির মধ্যেই আনেন না।

উত্তেজিত হলে নরহরি মাঝে মাঝে ইংরাজি বলে। এবং ওই রকম ইংরাজি বলে।

মুটুবাবু বাধা দিয়ে বললেন, ট্রাম আবার কোথায় পেলে? সাইকেল। ভীষণ সাইকেল এক্‌সিডেণ্ট।

ট্রাম্‌ নয়? সাইকেল? নরহরি ঈষৎ আশ্বস্ত হল। জিগ্যেস করলে কি হয়েছিল?

মুটুবাবু বললেন, আমরা দুজনে স্কট্‌স্‌ লেন থেকে বেরিয়ে কেবল আমহার্ষ্ট স্ট্রীটে পড়েছি, এমন সময়।

ঘোষাল মশাই এতক্ষণ পর্যন্ত চোখ বুঁজেই ছিলেন। চোখ মেলে হাতের ইঙ্গিতে মুটুবাবুকে বাধা দিয়ে বললেন, উঁহুঁ। সাইকেলটা তখন বৌবাজারের মোড়ে।

ঘোষাল মশাই ঝেড়ে উঠে বসলেন। চোখ পাকিয়ে বলতে লাগলেন, আমার সব টাইম বাঁধা কিনা! হিসেব করে দেখেছি পাঁচ মিনিটে একবার রেড রোড পার হওয়ার chance পাওয়া যায়। ও সব বৌবাজারের মোড়-টোড় মিনিট দুই লাগে। সেই হিসেব করে, মুটুবাবু আমহার্ষ্ট স্ট্রীট পার হতে যাচ্ছিলেন, আমিই আটকালাম। আটকালাম কি না?

ন্টুবাবু ঘাড় নেড়ে সায় দিলেন।

ঘোষাল মশাই পরবর্তী কাহিনী বলতে গিয়ে থেমে গেলেন। পেটে ছুটো কিল মেরে বললেন, দাঁড়ান, পায়খানা থেকে আসি।

নরহরি ভয়ে ভয়ে জিগ্যেস করলে, যেতে পারবেন তো? না, ধরে নিয়ে যাব?

হাত নেড়ে ঘোষাল মশাই বললেন, কিছু দরকার হবে না। এইখান থেকে এইটুকু তো!

ঘোষাল মশাই চলে গেলেন।

ন্টুবাবু তো হেসেই অস্থির। বললেন, এ ভদ্রলোকের সঙ্গে আর যদি রাস্তায় বেরুই!

—কি হয়েছিল?

—আরে, সাইকেলটা তখন বৌবাজারের মোড়ে, আমরা স্কট্স্ লেনের মোড়ে। ঘোষাল মশাই হাত চেপে ধরে বললেন, দাঁড়ান, দাঁড়ান সাইকেলটা যাক। এখুনি চাপা পড়বেন যে! আধ মিনিট কেটে গেল, সাইকেল আর আসে না। তখন বললেন, নাঃ! যাওয়াই যাক। বলে ছু'পা এগিয়েই ঠিক যেন বাইকের চাকার নিচে মাথাটা বাড়িয়ে দিলেন। সাইক্লিষ্টটা ভালো। কোনো রকমে সামলে নিলে। আর ঘোষাল মশাই গড়াতে গড়াতে ফুটপাথের ধারে গিয়ে পড়লেন তো আর ডাকাডাকিতেও সাড়া দেন না। এমন ভয় হয়েছিল!

— লেগেছিল নাকি খুব?

— বিশেষ নয়। তবে ভয় পেয়েছিলেন খুব।

ন্টুবাবু তামাক সাজতে বসলেন। তারপরে কলকেটা হুঁকোয় বসিয়ে ছুটো টান দিয়ে বললেন, আর একদিনের কথা তোমাদের বলি নি?

—না।

—এই গলিটার মোড়ে। ছুজনে আসছি। আমি আগে, ঘোষাল

মশাই পেছনে। তার ক'দিন আগে উনি নতুন জুতোয় নাল বসিয়েছেন। আপন মনে চলছি, হঠাৎ উনি জুতোসমেত লাফিয়ে পড়লেন আমার পায়ের গোছের ওপর। আমি তো উল্‌টে পড়লাম। উনি আমার ওপরে। দুজনে জড়াজড়ি করে গোটা রাস্তা গড়াগড়ি দিচ্ছি। কি ব্যাপার জানি নে। যদি একবার উঠেছি, ওঁর টানে আবার পড়ছি। আর পা দিয়ে অঝোরে রক্ত পড়ছে। রাস্তার লোকে তো দৌড়ে এসে শেষে আমাদের ওঠালে। আমি তো হতভম্ব, আর ঘোষাল মশাই থর থর করে কাঁপছেন। কি হল? কি হ'ল? ঘোষালমশাই তবু কথা বলেন না। আমার একখানা হাত ধরে কেবল থর থর ক'রে কাঁপেন! আমি তো অবাক! যন্ত্রণায় পা টন্‌টন্ করছে, অথচ কি যে হয়েছে জানি না। বহু কষ্টে ঘোষাল মশাই বললেন, ভুত! ভূত? কলকাতার রাস্তায় সন্ধ্যেবেলায় ভূত! লোকজনের হাসি তো থামে না। কোথায় মশাই? ওই সরু গলিটার মোড়ে যে ডাষ্টবিন, ঘোষাল মশাই সেই দিকে আঙুল দিয়ে দেখালেন।

হুটুবাবু আপন মনেই হাসতে হাসতে হুঁকোয় টান দিতে লাগলেন।

—কিছু দেখা গেল?

—গেল। হামাগুড়ি দিয়ে চলে সেই ভিখিরীটা। সে বেটাও ওঁর কাণ্ডে ভয় পেয়ে ডাষ্টবিনের আড়ালে লুকিয়েছে। চুপ কর। ঘোষাল মশাই আসছেন।

হুটুবাবু তামাকে মনোনিবেশ করলেন।

ঘোষাল মশাই নীচে থেকেই চেঁচাতে চেঁচাতে এলেন, একটা কথা আপনাকে বলা হয় নি, হুটুবাবু।

হুটুবাবু জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে ঘোষাল মশায়ের মুখের দিকে চাইলেন।

—কালকে আর·

কথাটা শেষ হতে পেল না। ঘোষাল মশায়ের পায়ে লেগে হারিকেন শেষ হতে পেল না। ঘোষাল মশায়ের পায়ে লেগে হারিকেন গেল উলটে মুটুবাবু তাড়াতাড়ি আলোটা তুললেন। বিশেষ কিছু হয় নি।

বিরক্তভাবে বললেন, এখানে অন্ধকারে আলোটা জ্বেলে রাখলে কে রে?

ঘোষাল মশাই শান্ত কণ্ঠে বললেন, ও সব চাকরবাকরের কাণ্ড আর কি! যাক গে। কালকের কথাটা বলি। কাল আর আফিস যাওয়া হয় নি।

—কি হয়েছিল?

ট্রেণ ফেল। আমাদের ওঁচা ষ্টেশনের কথা বলেন কেন? আসা-যাওয়া তো প্রায়ই করি। জানি কি না! ট্রেন আসামাত্র সবাইকে সাবধান করে দিলাম, উঠে পড়, উঠে পড়, গাড়ি বেশি দাঁড়াবে না। সবাই উঠল মশাই, শেষ পর্যন্ত আমারই আর ওঠা হল না।

ঘোষাল মশাই ফোঁকলা দাঁত বের করে শিশুর মতো হাসতে লাগলেন।

মুটুবাবু তামাক খাওয়া শেষ করে হুঁকোটা ঠেসিয়ে রেখে উঠলেন। গামছাখানা কাঁধে ফেলে বললেন, এখুনি যাবেন না, ঘোষাল মশাই। আমি হাত-মুখ ধুয়ে আসছি। এইখানেই আহ্নিক সেরে খাওয়া-দাওয়া করে তারপর যাবেন। এখনও আপনার শরীর দুর্বল কি না!

কথাটা ঘোষাল মশায়ের মনঃপূত হল। তিনি মাঝখানে আসর জাঁকিয়ে বসলেন। তাঁর মধুর কণ্ঠের সাড়া পেয়ে দাসু এবং জয়কালীও গান-বাজনা ফেলে উঠে এল।

দাসু জিগ্যেস করলে, ঘোষাল মশাই, মিষ্টির দোকানটা উঠিয়ে দিলেন? বেশ ছিল!

অর্থাৎ মেসের পক্ষে বেশই ছিল। নানা কারণে। বৈকালিক

জলযোগের জন্যে আর কাকেও গাঁটের পয়সা ব্যয় করতে হত না। অন্যমনস্কভাবে বেড়াতে বেড়াতে ওই পাড়ায় গিয়ে ঘোষাল মশায়ের সামনে পড়লেই হল। ব্যস্। একটি ঠোঙা খাবার বহু অনুরোধে তার হাতে গুঁজে দিয়ে তবে ঘোষাল মশায়ের অন্য কাজ।

ঘোষাল মশাই দুঃখিতভাবে বললেন, বেশ তো ছিল মশাই, কিন্তু চলল কই? আমার luck খারাপ। বুঝলেন? জামাতা বাবা-জীবনের যা বুদ্ধি, ওঁর চেয়ে ওঁর শাশুড়ীঠাকরুণকে বসিয়ে দিলে তিনি দোকান ভালো চালাতেন।

নরহরি বললে, শুনলাম কারিগর যা রেখেছিলেন তারা তেমন ভালো নয়। অথচ মাইনে বেশী নিত। যত আনাড়ি কারিগর আপনার দোকানে এসে হাত পাকিয়ে নিয়েছে। আমার অবশ্য শোনা কথা।

উত্তেজিতভাবে ঘোষাল মশাই বললেন, দূর থেকে অমন অনেক কথাই শুনবেন মশাই। যত-টত নয়, তবে দু'জন কারিগরের সম্বন্ধে আমার অবশ্য কিছু সন্দেহ ছিল। তাদের হাত তেমন পাকা ছিল না। কিন্তু মাইনে বেশি দেওয়া বিশ্বাস করবেন না। ত্রিশ থেকে চল্লিশ। সে কি আর মেঠায়ের কারিগরের যুগ্যি মাইনে মশাই? শুনবেন অমন অনেক কথা!

ত্রুটিস্বীকারের ভঙ্গীতে নরহরি বললে, কি জানি মশাই? বললাম তো, আমাদের শোনা কথা। বটুকবাবু বলছিলেন, তাই শুনেছি।

বটুকবাবুর কথায় ঘোষাল মশাই ভীষণ ক্ষুব্ধ হলেন। বটুক ঘোষ ছিলেন তাঁর মিষ্টান্ন-ভাণ্ডারের অন্যতম ম্যানেজার। তাঁরই মুখে এই কথা।

ঘোষাল মশাই উত্তেজিতভাবে হাত নেড়ে বললেন ওঃ! বটুকবাবু। আর তাঁর কীর্ত্তি শোনেন নি বুঝি?

—না তো!

—আমি উপস্থিত না থাকলেই তো হয়েছিল!

—কি রকম ?

ঘোষাল মশাই ভালো করে নড়ে চড়ে বসলেন। বললেন, ও রকম সময়ে কোনোদিন দোকানে বড় একটা যেতাম না। ভগবানের চক্র, ঠিক সেইদিনই গিয়ে উপস্থিত !

ঘোষাল মশায়ের ক্রোধ জল হয়ে গেছে। তিনি ফোঁকলা দাঁত বের করে হাসছেন।

বললেন, একজন খদ্দের এসে জিগ্যেস করলে, টাটকা রসগোল্লা আছে ? বটুকবাবু অম্লান বদনে বললেন, আছে। দিতে যাচ্ছিলেন মশাই, আমি বললাম, টাটকা রসগোল্লা কি করে থাকবে বটুকবাবু কাল তো ছানা আসে নি !

ঘোষাল মশাই হো হো করে হেসে উঠে বললেন, আমি জানি কি না ! বললাম, আপনাদের লোকসান হতে পারে, তাই বলে লোকের স্বাস্থ্য নষ্ট করার আপনাদের কোনো moral right নেই। লোকটি বটুকবাবুর মুখের ওপর শুনিয়ে দিয়ে গেল উনি না থাকলে ঠকাতেন তো ?

ওঁর হাসি আর থামে না। শব্দ নেই, শুধু গলাটা নাচছে।

হাসি থামিয়ে বললেন, তবে হ্যাঁ, এইটে চলবে।

—কাটা-কাপড়ের দোকানটা ?

—হ্যাঁ।

ডান করতল হারিকেনের স্বল্পালোকেই চোখের সুমুখে মেলে ধরলেন।

বললেন, শনির দশাটা এইবার কাটছে। আমি আগেই জানতাম কি না, আটচল্লিশ বছরের আগে আর সুসময় আসছে না।

আটচল্লিশের আর কত বাকী ?—নরহরি জিগ্যেস করলে। ঘোষাল মশাই আবার হো হো করে হেসে উঠলেন।

বললেন, আপনারা আমাকে ছেলেমানুষ ঠাউরেছেন না কি ? আটচল্লিশও পোজে নি ?

একটু থেমে আবার বললেন, তবে এটাতেও একটু মুস্কিল হচ্ছে।

—মুস্কিল আবার কি?

কবিওয়ালার মতো গালে একটা হাত দিয়ে ঘোষাল মশাই ভব্যযুক্ত হয়ে বললেন, একটা দিনের ঘটনা বলি শুনুন : অনেক হিসেব করে দেখিছি, পাঁচ সিকেতে যে শার্ট বাজারে বিক্রি হয়, তা বারো আনায় দিলেও লাভ থাকে।

—পাঁচ সিকের জিনিস বারো আনায়?

—আজ্ঞে হ্যাঁ মশাই! আপনারা তো বিশ্বাস করবেন না। আমার খদ্দেরও দাম শুনে পিছিয়ে যায়। বিশ্বাস করে না। অথচ সেই জিনিস পাশের দোকান থেকে পাঁচ সিকিতে নিয়ে যায় চাঁদপানা মুখ করে।

ঘোষাল মশাই হাসতে লাগলেন।

—তাই হয় মশাই!

—হয় মানে? হয়েছে। আমার দোকান থেকে খদ্দের ফিরে গেছে। পাশের দোকানদার আমারই কাছ থেকে সেই জিনিস নিয়ে গিয়ে পাঁচ সিকেয় বেচেছে।

ঘোষাল মশাই ললাটে করাঘাত করলেন।

বললেন, এত দুঃখেও হাসি আসে মশাই। আমার দোকানের শার্টের দাম দেখে পাশের দোকানদার বললে কি জানেন? বললে, বারো আনা! কাটুন, কাটুন। পাঁচসিকে করুন। বারো আনায় নেবে কেন মশাই? নতুন ব্যবসা করছেন বুঝি? রীতিমত অপমান করে গেল।

ঘোষাল মশাই সকলের মুখের দিকে পর্যায়ক্রমে চাইতে লাগলেন।

সুটুবাবু ফিরে এলেন।

—আসুন ঘোষাল মশাই! আহ্নিকের জায়গা করা যাক।

হ্যাঁ।

বলে ঘোষাল মশাই লাফিয়ে উঠলেন। সাইকেল দুর্ঘটনার কথা ভুলেই গেছেন বোধ হয়।

মুটুবাবু যত্ন সহকারে দু'জনের জন্যে দু'খানা কুশাসন পাতলেন। কোশাকুশী বের করলেন। নিজে একখানা ছোট ন'হাত কাপড় পরলেন এবং ঘোষালমশাইকেও একখানা দিলেন। তারপর দু'জনে আহ্নিকে বসলেন।

মুটুবাবু গণ্ডুষ করতে না করতে ঘোষাল মশাই সে সমস্ত সেরে চোখ বন্ধ করে দুলতে লাগলেন। সে বড় সহজ দোলা নয়, পাঠশালে কিম্বা মক্তবে বই পড়তে পড়তে ছেলেরা যেমন করে দোলে তেমনি দোলা।

মুটুবাবু চোখ বুঁজতে গিয়ে থমকে গেলেন। অবাক্ হয়ে একবার সে দৃশ্য দেখে ধীরে ধীরে চোখ বন্ধ করলেন। আহ্নিকের মন্ত্র তখন তাঁর স্মৃতিপট থেকে বেমালুম মুছে গেছে। মুটুবাবু তাই নিয়ে স্মৃতিশক্তির সঙ্গে রীতিমত যুদ্ধ আরম্ভ করে দিয়েছেন।

এমন সময়ে কেষ্টা এসে ডাকলে, ভাত খাবেন, না রুটি খাবেন?

মুটুবাবু কপাল কুঞ্চিত করলেন। সাড়া দিলেন না।

কেষ্টা আবার জিগ্যেস করলে, মুটুবাবুকে বলছি। ভাত খাবেন, না রুটি খাবেন?

মুটুবাবু আর ক্রোধ সম্বরণ করতে পারলেন না। তড়াক করে লাফিয়ে উঠলেন। ভয় পেয়ে ঘোষাল মশাইও সঙ্গে সঙ্গে লাফিয়ে উঠলেন।

—বলছি।

বলে একটা ছাতা নিয়ে মুটুবাবু কেষ্টাকে তাড়া করলেন।

কেষ্টা বোধ হয় এ জন্যে তৈরী হয়েই ছিল। মুটুবাবু লাফিয়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে এক ছুটে রাস্তায় গিয়ে দাঁড়াল।

মুটুবাবু তখন রাগে কাঁপছেন। কেষ্টাকে কি যে গাল দিচ্ছেন, সে আর বোঝা যাচ্ছে না। সবাই মিলে তাঁকে বহু কষ্টে শান্ত করবার চেষ্টা করলে।

নরহরি বললে, ছেলেমানুষ! হয় তো জানতো না!

—ছেলেমানুষ! জানতো না! আজ ওর হাড় এক জায়গায় মাংস এক জায়গায় করব তবে আমার নাম মুটবিহারী।

ছাতাটা যথাস্থানে রাখতে রাখতে বললেন, জানতো না! ওর সব বদমাইসী!

—না, না।

—আর না, না। তুমি আমার চেয়ে বেশী জান? পায়খানায় গিয়েছি। জানে, আমি পায়খানায় গিয়ে কথা বলি না, সেইখানে জিগ্যেস করতে গিয়েছে, ভাত খাব, না রুটি খাব। যখন ফিরে এলাম, একটি কথাও জিগ্যেস করলে না। পাশ কাটিয়ে পালাল। তক্কে তক্কে ছিল, কখন আহ্নিকে বসি। যেই বসেছি অমনি এসে উপস্থিত। বেটা হারামজাদা!

ঘোষাল মশাই এতক্ষণ পর্যন্ত চুপ করে ছিলেন। মুটুবাবু চুপ করতে বললেন, তাই হোক! আপনি যে রকম চমকে উঠলেন, ভাবলাম সাপ!

সাপের কথা বলেই ওঁর অন্য একটা কথা মনে পড়ে গেল। বললেন, আরে মশাই, ক'দিন থেকেই সাপের স্বপ্ন দেখছি। বলে, সাপের স্বপ্ন দেখলে টাকা পাওয়া যায়। এবারের লটারিটা লেগে যায় বুঝি।

ঘোষাল মশাই হো-হো করে হেসে উঠলেন। কিন্তু তখনই তাড়াতাড়ি সশব্দে গণ্ডুষ করে বললেন, যাক গে। আজ কেবলই আহ্নিকের বিঘ্ন হচ্ছে। বসুন মুটুবাবু!

বলে আর একবার গণ্ডুষ করে মাথায় গঙ্গাজল ছিটিয়ে আবার চোখ বন্ধ করলেন।

দু'জনে আবার জপে বসলেন।

রক্ষাকর তখনও ফেরে নি। ছোটরা দলে মাত্র তিন জন। রক্ষাকরের ফিরতে দেরী আছে। তার ভরসা কম। এখন মুটুবাবুর আহ্নিক শেষ হলেই তাসে বসতে পারে।

মুটুবাবুর দিকে বার কয়েক উৎসুকভাবে চেয়ে তারা ইতিমধ্যে মাদুর বিছিয়ে ফেললে এবং আগ্রহ দমনের জন্যে অকারণেই তাস পিটতে লাগল।

দল পর্যন্ত ভাগ হয়ে গেছে। তিন জনে তিন কোণে বসেছে। মুটুবাবুর জায়গাটা খালি। তিনি জপ সেরে উঠলেই খেলা আরম্ভ হবে।

হঠাৎ ঘোষাল মশাই জপ করতে করতেই সোয়েটারের এ-পকেট ও-পকেট খুঁজে মুটুবাবুকে এক ঠেলা দিয়ে লাফিয়ে উঠে বললেন, সর্বনাশ হয়েছে!

মুটুবাবু এবারে বোধ হয় অখণ্ড মনোযোগের সঙ্গে জপ করছিলেন। ঠেলা খেয়ে কনুই গেড়ে উপুর হয়ে পড়ে আর্তনাদ করে উঠলেন, মলাম রে!

ঘোষাল মশায়ের তখন সেদিকে মনোযোগ দেবার সময় নেই। তিনি লাফিয়ে উঠে আলনা থেকে কোট পেড়ে উন্মাদের মতো সেটা যেদিক সেদিক দিয়ে গায়ে দেবার চেষ্টা করছেন, আর ছটফট করছেন। পা লেগে কোশা-কুশী গেছে উলটে। গঙ্গাজলেব ধারা বয়ে চলেছে।

—কী হল? কি হল?

জয়কালী তাড়াতাড়ি এসে মুটুবাবুকে তুললে। দাসু আর নরহরি ঘোষাল মশাইকে শান্ত করার প্রয়াস পেতে লাগল।

—কি হল কি?

ঘোষাল মশাই তখন মাথার চুল ছিঁড়ছেন আর ঘরময় দাপাদাপি করে বেড়াচ্ছেন। তাঁর অবস্থা দেখে মুটুবাবু ঘেঁসটাতে ঘেঁসটাতে এক কোণে গিয়ে পুঁটুলির মতো জড় হয়ে বসেছেন।

—কি ব্যাপার কি বলুন না ?

ভগ্নকণ্ঠে ঘোষাল মশাই বললেন, সর্বনাশ হ'য়েছে ! টিকিট দিয়ে আসা হয় নি। গায়ের কাঁপড়টা দিন তো ?

টিকিট কি ?

টিকিট ! টিকিট ! আমার ছোট ছেলেটার টিকিট ! জানেন না ?

টিকিটের কথা সকলেই জানে। ঘোষাল মশাই সম্প্রতি দেশ থেকে তাঁর ছোট ছেলেটিকে কলকাতায় এনেছেন। ছেলেমানুষ, যদি কলকাতার রাস্তায় কোনোদিন হারিয়ে যায় সেজন্যে তার পকেটে একখানা টিকিট আছে : এটি আমার পুত্র শ্রীমান অমুক, নুতন কলিকাতায় আসিয়াছে। যদি দৈবদুর্বিপাকে কোনদিন হারাইয়া যায়, বা গাড়ি চাপা পড়ে, কিংবা অন্য কোনো দুর্ঘটনায় মৃত্যু ঘটে, দয়া করিয়া সকাল ছয়টা হইতে সাড়ে নয়টার মধ্যে ও অপরাহ্ণ ছয়টার পর অমুক ঠিকানায় এবং দশটা হইতে সাড়ে পাঁচটা পর্য্যন্ত অমুক ( আফিসের ) ঠিকানায় আমাকে সংবাদ দিলে অনুগৃহীত হইব। ইতি বিনীত শ্রীঅপরেশচন্দ্র ঘোষাল।

সেই টিকিটখানা আজ আফিস যাওয়ার সময় ছেলেটির পকেটে রেখে যেতে মনে ছিল না। মনে পড়ল এখন, আহ্নিক করবার সময়। দেখেন টিকিট রয়েছে সোয়েটারের পকেটে।

ঘোষাল মশাই ব্যস্তভাবে বললেন, দিন না গায়ের কাপড় খানা ! আঃ

ওদের আর দিতে হল না। তিনি নিজেই এক লাফে সেটা পেড়ে নিয়ে ঝড়ের বেগে বেরিয়ে গেলেন। বলতে বলতে গেলেন, ছেলেটা যদি ভগবানের ইচ্ছায় বেঁচে থাকে তবেই রাত্রে ফিরব, নইলে নয় !

সবাই জানে, ঘোষাল মশাই ব্যস্তবাগীশ লোক। তাঁর কোনো কাজে সেজন্যে কেউই ব্যস্তও হয় না, বিস্মিতও হয় না। ছেলেরা আবার এসে তিন কোণে তিন জন বসল।

এতক্ষণ পরে ন্টুবাবু নিঃশব্দে উঠলেন। আহ্নিকের আসন কোশাকুশী তুলে রাখলেন। মাথায় একটু গঙ্গাজল ছিটিয়ে, মাদুলির জল গণ্ডুষ করে, ঘরের যাবতীয় দেবদেবীর ছবির নিচে দেওয়ালে মাথা ঠেকিয়ে প্রণাম করলেন। তাঁর মাথার তেলে সে জায়গাগুলো কালো হয়ে গেছে।

এ সব সেরে কোঁথাতে কোঁথাতে আপন মনেই বিড় বিড় করে বলতে লাগলেন, আহ্নিক তো ভালোই হল! কার মুখ দেখে উঠেছিলাম কে জানে! ওদিকে আপিসে ওই! এদিকে শরীরের অবস্থাও এই! সারা রাত কেবল মরা মানুষের স্বপ্ন দেখি এইবার হয়ে এসেছে আর কি! বাড়ীর চিঠিও অনেক দিন পেলাম না। তারাই বা সব কেমন আছে ভগবান জানে! যাক্‌গে। আপিসে তো বেচাকেনা বন্ধ। বড় বাবুকে বললাম…যাকগে! কনুইটাও চিন্‌চিন্‌ করছে। রক্ত টক্ত পড়ল কি না দেখি! তাস পেড়েছ নাকি? বাঁটো বাঁটো। তোমাদের সঙ্গে খেলতেও ইচ্ছে করে না। হাঁটুর বয়িসী সব। লোকে দেখলেই বা বলবে কি।

ন্টুবাবু কাপড়ের খুঁটটা অনাবশ্যক একবার ফট্ ফট্ করে ঝেড়ে তাসের আসরে এসে বসলেন। বলতে লাগলেন :

—চুপ চাপ বসে থাকলেই নানা দুশ্চিন্তা আসে কি না। তাই একটু বসি। নাও, গুণে দু'বাজি খেলব। কত ডাক হল? কুড়ি? কে ডাকলে? আচ্ছা, আমি পাশ। ওরে কেষ্টা।

কেষ্টা নিচে থেকে মোলায়েম সুরে সাড়া দিলে, কি বলছেন?

—আরে, আমার ত্রিফলা ভিজুতে দিয়েছিস।

—দিয়েছি।

—বেশ, বেশ। কাপড়টা নীচে রেখে এসেছি, কেচে দিস তো বাবা। একটু জ্বরের মতো হয়েছে। আর জল ঘাঁটতে পারলাম না। গোলাম কার? ওদের? রং কি হয়েছে? নেই! যাক বাঁচা গেল।

কি করতে ডাকতে গেলে? খেলা হবে না। ফেলে দাও। বটুক বাবুকে দেখছি না তা? গেলেন কোথায়?

জয়কালী সশব্দে একটা তুরুপ করে বললে, নেমন্তন্নে।

মুটুবাবু খুশি হয়ে বললেন, তুরুপ করলে? বেশ বেশ। এমনি খেল দেখি বারকয়েক! কোথায় নেমন্তন্ন?

দাস্থু হেসে বললে, অবধূতের সবান্ধবে নেমন্তন্ন? সেই সূত্রে বটুক বাবুও গেছেন।

আর একটা পিঠ তুলতে মুটুবাবু বললেন, আজ তাহলে খাঁচি বোঝাই করবে বল? ভালোতে মন্দতে, অ্যাঁ? পেট নিটোল করে ফিরবে। কিসের নেমন্তন বটে?

জয়কালী বিরক্ত ভাবে বললে, কে জানে মশাই। বলছিল বিয়ের নেমন্তন্ন তাই শুনলাম।

একটা গোলাম খেলে মুটুবাবু জিগ্যেস করলেন, বরযাত্রী? না বৌভাত? তুমিও গেলে না কেন?

পিঠ তুলতে তুলতে জয়কালী বললে, আমি কি করতে যাব?

—কি করতে! ভালটা মন্দটা খেতে। শরীর খারাপ, শরীর খারাপ কর, শীতের ঘৃতপক্ক জিনিস খেলে গায়ে বল হত কত!

জয়কালী জবাব দিলে না। ফোঁটা গুণতে লাগল। গোণা শেষ হলে সশব্দে মেঝেয় একটা চাঁটি দিয়ে বললে, লাল বের করুন।

—হয়েছে?

—হবে না তো কি, ইয়ার্কি!

মুটুবাবু লাল বের করতে করতে বললেন, বেশ! বেশ! খেল তো তুমি ভালোই! মাঝে মাঝে মাথা বিগড়ে গেলেই যা তা খেল।

নরহরি আর দাস্থুতে লেগে গেল তুমুল ঝগড়া।

নরহরি বললে, আর ডাকলে না কেন?

দাস্থ বললে, কুড়ি অবধি ডাকলাম, আবার কত ডাকব? মাথা খারাপ! হা হা হা!

দাস্থ শেলায়ের কলের মতো মাথা নাড়তে লাগল।

নরহরি মুখ বেঁকিয়ে বললে, ডাকবে না? ওরা খেলা করবে?

দাস্থ মুরুব্বির মতো বললে, আরে বাপু, আমার হাতে ছিল কী? ওরই খেলা হত না।

—না, হ'ত না! আমি এখানে যেন গাছ বসে আছি। তোমার সঙ্গে বসাই ঝকমারি! নাও, বাঁটো! রক্ষাকরও এই সময় পালাল! একটু পরেই রক্ষাকর এল। এক বগলে তার শ্লেট, আর এক হাতে কতকগুলো কপি। উত্তেজনায় মুখ রক্তবর্ণ।

নুটুবাবু তাস থেকে চোখ তুলে জিগ্যেস করলেন, কাল যাচ্ছ না কি? কি কিনলে?

রক্ষাকর সে কথার উত্তর না দিয়ে বললে, বেশি খরচ হয়ে গেল। বাড়ি গিয়ে আর একটা পয়সাও হাতে থাকবে না।

নরহরি মেজাজের সঙ্গে বললে, আমি আর একটা পাইস্‌ও দিতে পারব না। এই এক কথা বলে দিলাম।

নুটুবাবু আবার জিজ্ঞ্যেস করলেন, কি কিনলে? কপি? তোমার কমলা লেবু আসবার কথা ছিল এসেছে? ওটা কি? শেলেট? সাবান কেননি? ঝাল মসলা? তবে আর কি কিনলে?

কথাটা সত্যি। রক্ষাকরের বাড়ীতে শিলেটের কমলা লেবু খাওয়ার লোক বেশি নেই। অত কপি নিয়েই বা করবে কি? তার চেয়ে কিছু ঝাল মসলা নিয়ে গেলে সংসারের অনেক উপকার হত। সাবান নিয়ে গেলে কাপড়ে দিয়ে বাঁচত। কিন্তু সাংসারিক বুদ্ধি রক্ষাকরের কম। সেই জন্যে মেসে তাকে বলে, হুপুঠাকুর। বহুকষ্টে নরহরির দাক্ষিণ্যে ক'টা টাকা পেল। তাও হিসেব করে খরচ করতে পারলে না। আবার কিছু কম পড়ল।

ন্টুবাবু বললেন, আচ্ছা, যা হয়েছে তা হয়েছে। বস দেখি এক বাজি। তোমার জন্যে খেলা আটকে আছে।

খেলায় রক্ষাকরের নেশা অসাধারণ। যত গুরুতর কাজেই থাক, তাস পড়লে আর রক্ষা নেই। সব কাজ পণ্ড হবে। ন্টুবাবুরও নেশা আছে বটে, কিন্তু এত নয়।

রক্ষাকর অর্থের অপব্যয় সম্বন্ধে আক্ষেপ করবার অবসর পেলে না। কপিগুলো এক কোণে ফেলে রেখে বললে, এই যে, যাই।

ন্টুবাবু বললেন, ওঠো জয়কালী। রক্ষাকরকে একটু খেলতে দাও।

কিন্তু নরহরি তাকে আপত্তি জানালে। বললে, না, না, ওখানে নয়। দাসুকে উঠিয়ে দাও। দিয়ে বস। আনাড়ী নিয়ে খেলা পোষায় না।

দাসুও ঝাঁঝিয়ে উঠল। বললে, তুমি ওঠ না কেন? খেলা শেখ, শিখে খেলতে এস।

ঝগড়া ক্রমেই বেড়ে চলল। অবশেষে নরহরি বিরক্তভাবে উঠে বিছানায় গিয়ে লেপ মুড়ি দিলে। আর তার জায়গায় রক্ষাকর বসল।

খানিক পরে পান চিবুতে চিবুতে হাবলু এল।

এবেলা পোষাকটা বদলেছে। হাতে "সুনয়নী সাহিত্য মন্দিরের" "দলিতা ফণিনী"। মলাটের ওপর দর্পণের সম্মুখে প্রসাধননিরতা ঈষন্নগ্নবক্ষা একটি রমণীর রমনীয় রঙীন ছবি।

এসেই বললে, কাল গড়ের মাঠে প্যারেড্ দেখতে যাচ্ছেন তো?

কিন্তু সে কথা কারও কাণে গেল না। তখন "দলিতা ফণিনী" নিয়ে কাড়াকাড়ি পড়ে গেছে। আগ্রহ রক্ষাকরের সব চেয়ে বেশি। কিন্তু তাকে সবাই প্রথম চোটেই থামিয়ে দিলে।

বললে' তুমি কাল বাড়ী যাচ্ছ, পড়বে কখন?

—কেন, ট্রেনে।

জয়কালী ব্যঙ্গ করে বললে, ওরে বাবা! সখ দেখে বাঁচি নে। সে সব হবে না। আমায় দিন মশাই, কাল বিকেলে ফেরত পাবেন।

হাবুল হাঁটু দোলাতে দোলাতে বললে, পাগল!

মুটুবাবু বললেন, আরে, ও বইএর তুমি বুঝবে কি! খুব কঠিন বই, একটা লাইনও বুঝতে পারবে না।

জয়কালী তখন বইখানা ছিনিয়ে নিয়ে হাঁটুর নিচে রেখেছে। মাথায় একটা ঝাঁকি দিয়ে বললে, না মশাই, বুঝতে পারব না? অ মাদের প্রেসে কত বই ছাপা হয়! তার লেখাই আপনারা কেউ পড়তে পারবেন না, এমম জড়ান।

ক্ষুণ্ণ কণ্ঠে আবার বললে, কত বই পড়লাম মশাই! বুঝতে পারব না! হুঁঃ!

মুটুবাবু বললেন, তা বলিনি। তুমি পড়বে কখন? প্রেসের কাজ করবে? না, পড়বে?

চাকরী ছাড়ার কথাটা আর জয়কালী এই মজলিসে প্রকাশ করতে সাহস করলে না। পাছে দাদার কাণে ওঠে। সে স্থির করেছে, ছুপুর বেলাটা কলেজ স্কোয়ারে কাটাবে। "দলিতা ফণিনী" হবে সময় কাটানোর অবলম্বন। সেই জন্যেই এত আগ্রহ।

কিন্তু হাবলুকিছুতে সম্মত হল না। বললে, পাগল নাকি! আমি নিজেই এখনও পড়ি নি। অনেক দিন থেকে বইখানা পড়বার জন্যে খুঁজছিলাম। বহু কষ্টে পেয়েছি। না পড়ে আমি ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বরকেও দোব না।

তবে আর নশ্বর মানব সন্তানের আশা ভরসা কি! জয়কালী অনিচ্ছার সঙ্গে বইখানা বের করে দিলে।

দাসু শেলায়ের কলের স্ুঁচের মতো মাথাটা নেড়ে নেড়ে হাসলে।

বললে' ওই এক রোগ! আমার এক দাদা আছে, নব্বুই টাকা দিয়ে বই কিনেছে।

মুটুবাবু বিস্ময়ে চক্ষুস্থির করলেন, বললেন বল কি হে! এ বাজারে এক বিঘে উৎকৃষ্ট জমি হত যে! তোমার দাদার মাথা খারাপ না কি!

দাসু সেই রকমভাবে মাথা নাড়তে নাড়তে তাস বাঁটতে লাগল। কিছু উত্তর দিলে না!

নিজের তাস তুলে নিয়ে জয়কালী গম্ভীরভাবে বলল, অত সখ আমার নেই।

নরহরি এতক্ষণ নিঃশব্দে পড়ে ছিল। এখন কাছিমের মতো লেপ থেকে মুখ বের ক'রে বললে, আরে দিয়ে দাও ওর বই। কত বই চাও বল না!

মুটুবাবু জিগ্যেস করলেন, তুমি বই কোথায় পাবে?

নরহরি বিছানা ছেড়ে উঠতে উঠতে বলল, দু'চার খানা বইএর জন্যে কাজ আটকায় না! বুঝলেন? নরহরিবাবু থাকতে।

জয়কালী বিরক্ত হয়ে বললে, ওঃ! ভারি আমার বাবু!

—একশোবার বাবু! এ মেসে বাবু যদি কেউ থাকে তো আমি। সব ক'টাকে পকেটে পুরতে পারি। চলহে দাসু, খেয়ে আসি।

—নিশ্চয়

বলে হাবলুর হাতে তাস দিয়ে দাসু উঠল।

নরহরি বলতে বলতে গেল, বই পড়ে সব হবে!

সবাই খাওয়া-দাওয়া সেরে বিছানা পেতে শোয়ার আয়োজন করছে এমন সময় বটুক ঘোষ আর অবধুত ফিরে এল। রাত্রি তখন এগারোটার কম নয়! অবধুত আর দাসু দুই ভাই এক বিছানায় শোয়। দাসু আগেই দু'খানা মাদুর পর পর পেতে বিছানা তৈরী করেছে।

কিন্তু অবধুত ফুদ্ ফুদ্ আরম্ভ করলে:

ঝাঁট দেওয়া হয়েছে? ঝাঁট হয়েছে? বালি কিচ্ কিচ্ করছে যে। দাস্থ, ওঠ। ওরে কেষ্টা!

দাস্থর কেবল ঘুম আসছিল। বিরক্তভাবে বললে, ঝাঁট দিয়ে গেছে কেষ্টা।

—গেছে! এ সব কি হয়ে আছে! হুঁঃ! বালি কিচ কিচ করছে। এই কেষ্টা!

নিচে থেকে কেষ্টা সাড়া দিল. এখুনি ঝাঁট দেলাম যে!

দাস্থ রেগে বললে, তবে আপনি যে-টুকুতে শোবেন সেইটুকু ঝাঁট দিয়ে নিন। আমি আর উঠতে পারব না। প্রত্যহ ঠিক ঘুমের সময় এসে বিরক্ত করা। জিজ্ঞেস করুন দেখি পাঁচজনকে, ঝাঁট দিয়েছে কি না

অবধূতের তবু বিশ্বাস হ'ল না। বললে, পাঁচজনকে আবার জিগ্যেস করব কি? আমি নিজে দেখতে পাচ্ছি না?

—তবে যা মন তাই করুন, আমি আর উঠতে পারি না।

বলে দাস্থ পাশ ফিরে শুল।

জয়কালী মাথা তুলে বললে, আরে মশাই, ঝাঁট দিয়েছে। আপনার যত বাড়াবাড়ি। তবু যদি একটা তোষক থাকত!

অবধূত খেঁকিয়ে বললে, উঃ! তোষক থাকত! তুমি শোও না ওইখানে। দেখি কেমন বাহাদুর!

জয়কালী তৎক্ষণাৎ রাজি হয়ে বললে, আস্থন এইখানে। আমি ওখানে শুচ্ছি।

এ প্রস্তাবেও অবধূত রাজি হল না। শেষ পর্যন্ত দাস্থকে সে ওঠালে। নিজে একটা ঝাঁটা এনে জায়গাটা পরিষ্কার করলে। মাতুর তুটো ফের ঝেড়ে নতুন করে পাতলে। বিলিতি কম্বল এবং ছেঁড়া কাপড়খানা যা যথাক্রমে তোষক এবং বিছানার চাদর হিসেবে ব্যবহৃত হয় সে তুটোও ফের নতুন করে পাতা হল। এই আধ ঘণ্টা দাস্থ একটা কোণে ঠেস দিয়ে ঝিমুতে লাগল।

বিছানা পাতা হলে নরহরি বললে, ওহে অবধূত, তোমার একখানা চিঠি আছে। পড়ে ছ?

অবধূত আঁচল দিয়ে গাত্রমার্জনা করে বললে, না পড়ি নি। রেখে দাও, কাল সকালে পড়ব।

জয়কালী হেসে উঠল।

বললে, ও চিঠি সকালের ডাকে এসেছে। তখন থেকে পর্যন্ত পড়বার সময়ই পেলেন না? কি এমন কাজ?

—তুমি কি বুঝবে? তুমি কি বুঝবে?

বলে অবধূত আপন মনে বিড় বিড় করে কি বলতে লাগল।

নিচে থেকে ঘোষাল মশাই চেঁচিয়ে বললেন, মুটুবাবু, ছেলেটাকে পাওয়া গেছে মশাই।

—পাওয়া গেছে? কোথায় গিয়েছিল?

—কোথাও যায় নি। ভগবান রক্ষা করেছেন! শরীরটা খারাপ ছিল বলে আর কোথাও বেরোয় নি।

—বেশ।

তারপরে বটুক ঘোষের দিকে ফিরে মুটুবাবু জিজ্ঞেস করলেন, কি রকম হ'ল মশাই?

—বেশ হল।

—লুচি ক'খানা?

বটুক ঘোষ মুটুবাবুর দিকে পাশ ফিরে শুয়ে বললেন, লুচি বেশি খাই নি খান আঠারো। তবে মাছ খেয়েছি প্রচুর। আর মিষ্টি ও সব মিলিয়ে সের দুই হবে!

—তবে তো বেশ ভালোই ঠেসেছেন। অবধূত, তুমি ক'সের মিষ্টি ঠাসলে হে? সের তিনেক?

অবধূত শুধু উপেক্ষা ভরে একটা চুমকুড়ি দিলে। আর বটুকবাবু ফিক ফিক করে হেসে উঠলেন।

মুটুবাবু বুঝলেন, কিছু একটা ঘটেছে।

ভালোমানুষের মতো জিজ্ঞ্যেস করলেন, কেন? কি হয়েছে? জিনিসপত্র ছিল না?

অবধূত বারকয়েক উপেক্ষাভরে চুমকুড়ি কাটলে। তারপর বললে, থাকবে না কেন মশাই। সব যে তাড়াতাড়ি খায়, যেন ট্রেন ধরতে হবে।

বটুকবাবু নিরীহভাবে বললেন, যা বলেছেন! এক ঘণ্টার মধ্যে খাওয়া দাওয়া সেরে সব উঠে পড়ল।

অবধূত রসিকতাটা ঠিক ধরতে পারলে না। বললে, হুঁ। আমি যখন কপির তরকারীটা খাচ্ছি, তখন সব মিষ্টি খেয়ে গেলাসে হাত ধুচ্ছে।

—তাহলে মিষ্টি আর তোমার অদৃষ্টে হল না?

—হবে না কেন? উঠে আসবার সময় তাড়াতাড়িতে একটা মুখে ফেলে দিলাম।

বলে অবধূত মিট মিট করে চেয়ে ফিক ফিক করে হাসতে লাগল।

নীচে ঘোষাল মশায়ের মুখ ধোয়ার শব্দ পাওয়া গেল।

মুটুবাবু তাড়াতাড়ি লেপ মুড়ি দিয়ে ফিস ফিস করে বলেন, শুয়ে পড়। শুয়ে পড়। ঘোষাল মশাই যদি জানতে পারেন আমরা জেগে আছি, আবার এসে হৈ চৈ আরম্ভ করবেন।

ঘোষাল মহাশয়ের ভয়ে জয়কালী তাড়াতাড়ি উঠে আলোটা নিভিয়ে দিল

## শেষ